দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ৬ সংখ্যা।। ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২।। ৯ আশ্বিন - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

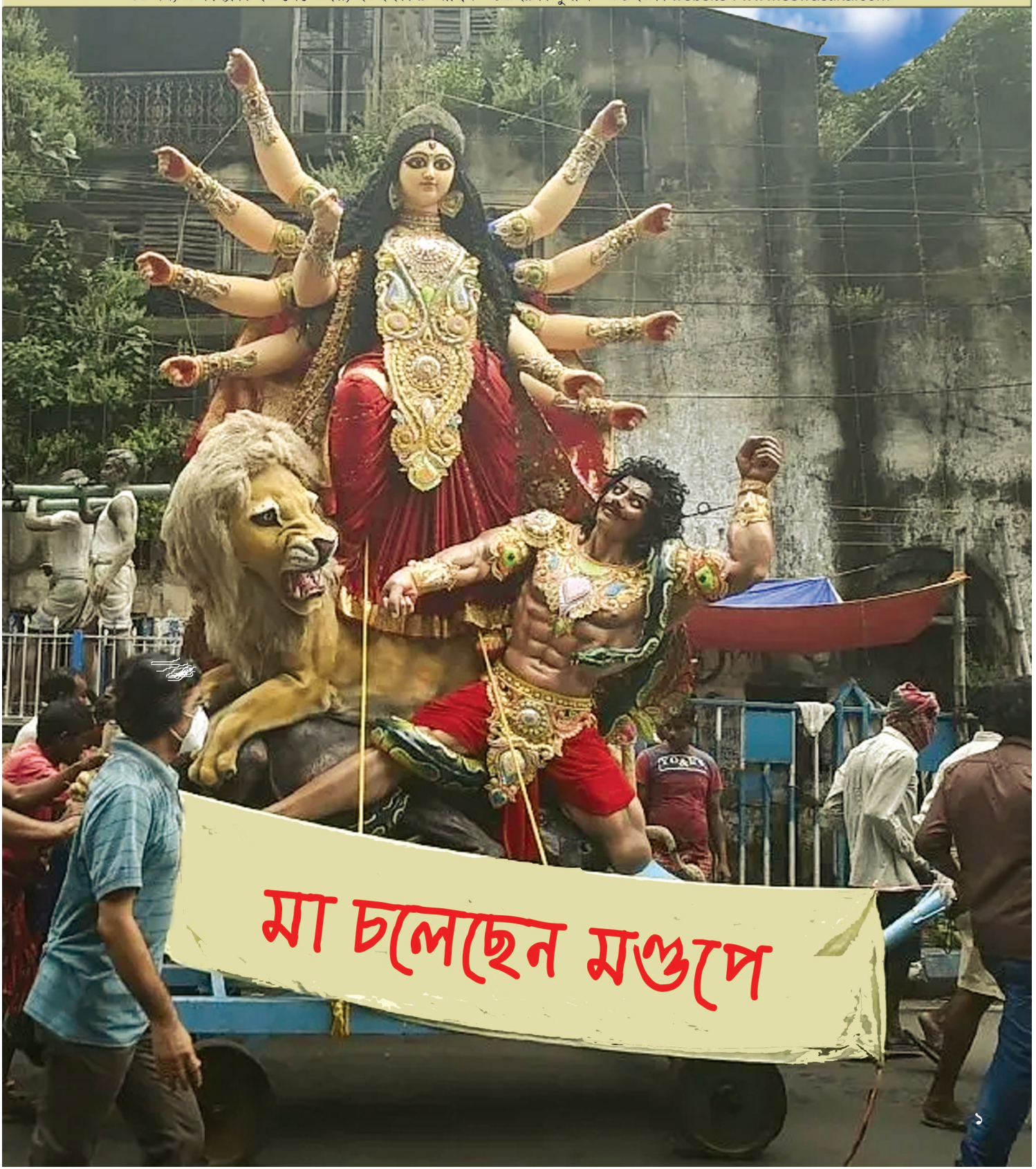

মা চলেছেন মণ্ডপে

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ৯ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৬ সেপ্টেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

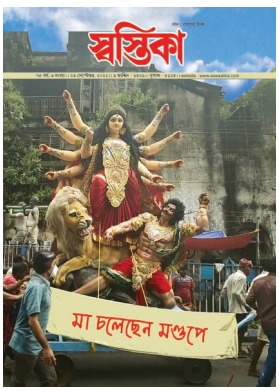

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

ইউনেস্কোর স্বীকৃতিতে মুছবে না মমতার কালিমা
☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

মা দুর্গা টিভি দেখেন? ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

দুর্গাপুজোর নানারঙের দিনগুলি ☐ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৮

চকচকে মণ্ডপে ম্রিয়মাণ ভক্ত ☐ নিখিল চিত্রকর ☐ ১০

রূপনারায়ণের ঘাটে শচীনকত্তার গান ☐ সন্দীপ চক্রবর্তী ☐ ১১

শ্রীদুর্গানাম ভুলো না মন ☐ রামানুজ গোস্বামী ☐ ১৩

দুর্গাপুজোয় আনন্দে মেতে ওঠে ঢাকা শহর ☐ জীবন কুমার রায় ☐ ১৫

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দুর্গাপূজা ☐ সুব্রত আচার্য ☐ ১৬

মহাদেবীর আগমন বার্তায় সেজে উঠেছে বাংলাদেশ
☐ প্রান্ত সরকার ☐ ১৬

দুর্গাপূজা মানেই বাঙ্গালির অনন্য উৎসব ☐ শেখর সেনগুপ্ত ☐ ১৭

ভয়কে জয় করতে আমরা দুগ্গা দুগ্গা জপ করি ☐ সুবল সরদার ☐ ১৮

দিল্লির বাঙ্গালিদের চোখে দুর্গাপূজা ☐ পিয়াসা গোস্বামী ☐ ২২

পুজোর কথায় এখনও বাঙ্গালির বুকে শিউলি ফোটে
☐ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ২৩

মায়ানগরী মুম্বাইয়ের দুর্গাপূজা ☐ সঞ্জীব দে ☐ ২৬

বাঙ্গলাজুড়ে হরেক রূপে মায়ের আগমন ☐ নিজস্ব প্রতিনিধি ☐ ২৮

অসমের দুর্গাপুজোয় নৈবেদ্য দেওয়া হয় স্প্রাউট
☐ চিন্ময়ী রায় দে ☐ ৩০

কৈলাস বোস স্ট্রিটে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা
☐ সপ্তর্ষি ঘোষ ☐ ৩১

দুর্গাপুজো বাঙ্গালিদের মিলন মেলা ☐ ড. মঞ্জু সরকার ☐ ৩৩

মায়ের হাসিমুখ সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয় ☐ অঞ্জন অধিকারী ☐ ৩৫

পূজার কটাদিন মনে হয় যেন বাঙ্গলাতেই আছি
☐ আরতি দে সরকার ☐ ৩৬

অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির বিজয় বিজয় দশমী উৎসব
☐ ড. প্রণব কুমার বর ☐ ৩৭

দুর্গাপুজোয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও ভণ্ডামি ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ৩৯

জনজাতি সমাজেও দুর্গাপূজা আনন্দের বার্তা বয়ে আনে
☐ উত্তম কুমার মাহাতো ☐ ৪৩

প্রবাসের পুজোয় আন্তরিকার অভাব নেই ☐ তানিয়া বেরা ☐ ৪৪

টেমসের ধারে কাশফুল আর চাঁদের আলোয় মায়ের বোধন
☐ সারদা সরকার ☐ ৪৫

পুজোর দুটোদিন আমরা দেশ থেকে বহু দূরে থাকার দুঃখ ভুলে যাই
☐ হৈমন্তী ব্যানার্জি ☐ ৪৬

দুর্গা : এক পরিপূর্ণ রাষ্ট্রভাবনা ☐ সূর্যশেখর হালদার ☐ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

অঙ্গনা : ১৯-২০ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২১ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে
১৭ অক্টোবর
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৭ অক্টোবর
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ধনতেরাসে সোনা

ধনতেরাসে কোনও ধাতু বিশেষ করে সোনা বা রুপো কেনা কেন শুভ? কালীপুজোর আগে ধনতেরাস সারা ভারতেই একটি জনপ্রিয় উৎসব। গত প্রায় এক দশকে পশ্চিমবঙ্গেও এই উৎসব ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ধনতেরাসের দিন গহনার দোকানের সামনে লম্বা লাইন দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো জায়গায় রাতভোর চলে কেনাকাটা। যার যেমন সামর্থ্য প্রত্যেকেই এই দিনে সোনা বা রুপোর অলংকার কিনে থাকেন। কিন্তু বছরের একটি বিশেষ দিনে আলাদা করে এই কেনাকাটার কী কারণ থাকতে পারে? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হবে। লিখবেন অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়, ভবানী শংকর বাগচি প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মা দুর্গাই ভারত জননী

পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের সূচনা হইয়াছে। প্রকৃতিদেবীই মূলত মায়ের আগমন বার্তা বহন করিয়া আনে। বিগত কয়েক দশক ধরিয়া মায়ের এই আগমন বার্তাকে সরবে ঘোষণা করিতেছে আকাশবাণী সম্প্রচারিত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠের সুর। বঙ্গবাসী তো বটেই, বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে থাকা বাঙ্গালির মন তখন কেমন করিয়া ওঠে। বস্তুত মহালয়া হইতেই বাঙ্গালির পূজা শুরু হইয়া যায়। বাঙ্গালির ঘরে বারো মাসে তেরো পার্বণ হইলেও দুর্গাপূজাই বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠপূজা, ইহাতে কোনো দ্বিমত নাই। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের মনে প্রাণে এই সময় সুখানুভূতি উঁকি মারিতে থাকে। বংশানুক্রমিক পূজা এখন হাতে গোনা। পূজা এখন বারোয়রি অথবা সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পূজার কয়টি দিন সমস্ত বঙ্গবাসীই যেন বাঙ্গালি হইয়া পড়েন। তখন ভিন রাজ্যের মানুষকেও বাঙ্গালি বলিয়াই মনে হয়। তাহারাও সপরিবারে বাঙ্গালিদের সহিত মিশিয়া যান। সমগ্র প্রদেশকে এই সময় বঙ্গসংস্কৃতিতে জারিত করিবার কৃতিত্ব পুরোটাই কিন্তু বাঙ্গালির। তাহারাই মা দুর্গকে সর্বজনীন করিয়াছে, আবার সর্বজনীন হইতে বিশ্বজনীনও করিয়াছে। ভারতবর্ষের যে কোনো রাজ্যে থাকা বাঙ্গালি যেরূপ দুর্গাপূজায় ব্রতী হইয়াছে, তেমনই বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে থাকা বাঙ্গালি সেইখানেই মাতৃ আরাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তথাকার মানুষজনকেও সেই পূজায় শামিল করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এবং বিশ্বের দেশে দেশে দুর্গাপূজা এখন আর শুধু বাঙ্গালির একার নহে, তাহা ভারতবর্ষীয়দের। দুর্গাপূজা বরাবরই মহাপূজা, মহা মিলনের পূজা। এই রাজ্যের বাহিরেও যেখানে যেখানে বাঙ্গালি রহিয়াছেন, সেইখানেই দুর্গাপূজার আয়োজন করিয়া সেই সেই রাজ্যের মানুষদেরও শামিল করিয়াছেন। তাই দুর্গাপূজা বাঙ্গালি তথা ভারতীয় জীবনের এক শক্তিশালী যোগসূত্র। যুগ যুগ ধরিয়া দুর্গাপূজা ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আসলে দুর্গাপূজাই তো রাষ্ট্রপূজা। মা দুর্গাই তো ভারত জননী। তাই দুর্গাপূজা এই মহাজাতির মহা মিলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব।

জাতির মহামিলনের এই মহা আনন্দদায়ক পরিবেশটিকে কেহ কেহ মলিন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিদেশি মতাদর্শ-পুষ্ট তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নামধারী ব্যক্তিবর্গ ভারতবর্ষের সংহত রূপটিকে কখনোই ভালো চোখে দেখেন নাই। দেশ ও জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিতে ও দেখিতেই তাহারা অভ্যস্ত। দুর্গাপূজার মহামিলনের মধ্যেও তাহারা বিভেদের বীজ বপন করিবার অপচেষ্টা করিয়া থাকেন। দুর্গাপূজায় জনজাতি সমাজের মানুষদের অংশগ্রহণ তাহারা মানিয়া লইতে পারেন না। শোকের দিন বলিয়া প্রচার করিয়া তাহাদের দূরে রাখিবার অপপ্রয়াস করেন। সাঁওতাল সমাজের পুরুষদিগকে মহিষাসুরের প্রতিভূ বলিয়া দুর্গাপূজা হইতে দূরে রাখিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের এই অপপ্রচারে কর্ণপাত না করিয়া জনজাতি সমাজের মানুষ এই মহাপূজার দিনগুলি নানাভাবে উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামে গ্রামে ইহার প্রমাণ মিলিবে। জেলাকেন্দ্রের শহর, এমনকী খোদ কলকাতার পূজামণ্ডপও তাহারা ধামসা, মাদলের তালে নৃত্য করিয়া মুখর করিয়া রাখেন। তাহাদের সেই দাশাই নাচ মা দুর্গার উদ্দেশেই নিবেদিত। নিঃসন্দেহ তাহারা ভারতীয় সমাজ জীবনের অভিন্ন অঙ্গ। দুর্গাপূজা বাঙ্গলা, বাঙ্গালি তথা ভারতবর্ষের একান্ত গর্বের বিষয়। সেই মহিমাকে সম্প্রতি অধিকতর মহিমান্বিত করিয়াছে ইউনেস্কোর হেরিটেজ ঘোষণায়। দুর্গাপূজাকে সর্বজনীন হইতে বিশ্বজনীন করিয়াছেন বাঙ্গালিরাই। স্বীকৃতি আনিবার কাজটিও কারিয়াছেন এক বাঙ্গালি কন্যা– তপতী গুহঠাকুরতা। দুর্গাপ্রতিমাই যে রাষ্ট্রপ্রতিমা তাহাও প্রমাণিত হইল এই স্বীকৃতির মাধ্যমে। বহু কোটি টাকার লেন-দেন, বহু শিল্পীর ভাবনাচিন্তা, বহু মানুষের অংশগ্রহণ, বহু মানুষের পরিশ্রম, বহু মানুষের সংবৎসরের উপার্জন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হয়। তাই নিঃসন্দেহ মা দুর্গার পূজাই ভারতজননীর পূজা।

সুভাষিতম্

ভদ্রমিচ্ছন্তঃ ঋষয়ঃ স্বর্বিদঃ তপো দীক্ষামুপসেদুরগ্রে।

ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চজাতম্ তদস্মৈ দেবাঃ উপসংনমন্তু।।

আত্মজ্ঞানী ঋষিগণ সৃষ্টির শুরুতেই জগতের কল্যাণ কামনায় কঠোর তপস্যা করেছেন বলেই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রতেজ উৎপন্ন হয়েছে। সেজন্য জ্ঞানীব্যক্তিরা নম্র হয়ে রাষ্ট্রের সেবা করে থাকেন।

ইউনেস্কোর স্বীকৃতিতে মুছবে না মমতার কালিমা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি'র সঙ্গে নিজের 'কবিতাবিতান' রাষ্ট্রসঙ্ঘ (ইউনেস্কোর) প্রতিনিধিদের উপহার দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার জানা নেই এর আগে আর কোনো অর্বাচীন বাঙ্গালি এই ধরনের দুঃসাহস দেখিয়েছেন কি না। মমতার দলের এক নিভু নিভু সাংসদ ঠারেঠোরে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি মেলা কঠিন কাজ। কলকাতার দুর্গাপুজো নিয়ে মমতা তা করে দেখিয়েছেন। কলকাতার দুর্গাপুজো পেয়েছে 'অস্থাবর ঐতিহ্য বা ইন্ট্যানজিবল হেরিটেজ'-এর তকমা। কয়েকদিন আগে তৃণমূলের দুর্নীতি আর পচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ব্রাত্য হন এই সাংসদ। এখন রাজনৈতিক বাজার খারাপ বুঝে উলটো গাওনা গাইছেন। ২০১০ সালে পুরুলিয়ায় ছৌ-নাচ রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃতি পায়। বামপন্থীদের মস্তিষ্কে অক্সিজেন কম যায়। তাই মর্যাদা বুঝতে পারেনি। বাতিল তত্ত্ব ছাড়া এখন তারা কিছু বোঝে না। আর সুষ্ঠু প্রশাসন ছাড়া মমতা সব বোঝেন। বামেরা যথার্থ তাঁকে 'খেলা-মেলার' মুখ্যমন্ত্রী বলে ডাকেন। বিজেপি বলে 'ডাকাত রানি'। পশ্চিমবঙ্গ এখন দুর্নীতি রাজ্য। তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিরোধীরা যে খুব একটা এগিয়ে রয়েছে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। মমতা যে দুর্নীতির অভয়ারণ্য এই রাজ্যে তৈরি করেছেন তাতে কম-বেশি করে ঢুকে রয়েছে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল।

২০২৩ পঞ্চায়েত ভোট অ্যাসিড টেস্ট বা আসল পরীক্ষা। ২০১১-য় বাম বিদায় শুরু হয়েছিল ২০০৮-এর গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে। তিন বছরের মধ্যে তাসের ঘরের মতো ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বামেরা। ২০১৩ থেকে শুরু হয় মমতা জমানার পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি। দশ বছরে তা চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। মমতা প্রশাসনে 'নাম্বার টু' পার্থ চট্টোপাধ্যায় দু'মাস ধরে জেল-যাপন করছেন। সঙ্গে দলের রাঢ়বঙ্গের প্রধান কাণ্ডারি অনুব্রত (কেষ্ট) মণ্ডল। পার্থর বিরুদ্ধে অভিযোগ বেআইনি অর্থ হেরাফেরি। অনুব্রত গোরু পাচারকারী। জুড়ে আছে কয়লা আর বালি পাচার। আর মমতার পরিবার।

এর মধ্যেই বেমানান আর হাস্যকর ভাবে উঁকি দিচ্ছে মমতার 'কলকাতার দুগ্গাপুজো'র তকমা। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের নজর ঘোরাতেই পুজো নিয়ে মমতার ঢক্কা নিনাদ। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে 'কলকাতার দুর্গাপুজো' আর ৬০ হাজার টাকা করে অনুদান পাচ্ছে রাজ্যের ৪৩ হাজার পুজো কমিটি। অনুদানে খরচ ২৪০ কোটি টাকা। অথচ দশ বছরে রাজ্যের ৭ হাজারেরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সরকারি কর্মীদের বাকি পড়েছে ২৭ হাজার কোটি টাকা মহার্ঘভাতা।

> মমতা 'ভ্রমাত্মক', 'মেঘনাদ' আর 'বহুরূপী'। রাজ্যের জনগণের চোখে তাঁর ঠুলি পরানোর নতুন নমুনা ইউনেস্কো স্বীকৃতি। তবে তাতে কয়লার ময়লা ধুয়ে যাবে না। মমতার কালিমা মোছাবে না ইউনেস্কোর স্বীকৃতি। মানুষের নজর ঘুরবে না।

২০০২ থেকে প্রায় দু' দশক ধরে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে দুর্গাঠাকুরের ঐতিহ্য তুলে নিয়ে এনেছিলেন স্বভাব বামপন্থী শিল্পী ইতিহাসবিদ তপতী গুহঠাকুরতা আর তাঁর বিশেষজ্ঞরা। ভারত সরকার চেয়েছিলেন তা হোক 'ভারতের দুর্গাপূজা'। কিন্তু তা করা যায়নি। সংগীত নাটক আকাদেমির কাছ থেকে এই কাজ পেয়েছিলেন তপতী। প্রথমবার তা বাতিল হয়ে যায়। ২০২১-এর ডিসেম্বরে সাফল্যের খবর আসে। অত্যন্ত বেদনার যে, জনমানসে প্রচার করা হয় এটা মমতার সাফল্য। মমতা অবশ্য তাঁকে সম্মান দেখাতে কোনো কুণ্ঠা করেননি। তাঁকে সামনের সারিতে রেখেছেন। কিন্তু বলেননি 'আমি কেউ নই।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সঙ্গে তাঁর নিজের কবিতার বই উপহার দিতে হাত কাঁপে না মমতার। তাই কিছু আশা না করাই ভালো। ভাবতে অবাক লাগে, গোরু পাচারে অভিযুক্ত কেষ্ট মণ্ডল আর ইউনেস্কো তকমাকে একসঙ্গে কীভাবে আগলান মমতা। এক অসম্ভব বৈপরীত্যের সমাহার। তাই মমতা 'ভ্রমাত্মক', 'মেঘনাদ' আর 'বহুরূপী'। রাজ্যের জনগণের চোখে তাঁর ঠুলি পরানোর নতুন নমুনা ইউনেস্কো স্বীকৃতি। তবে তাতে কয়লার ময়লা ধুয়ে যাবে না। মমতার কালিমা মোছাবে না ইউনেস্কোর স্বীকৃতি। মানুষের নজর ঘুরবে না। ◻

মা দুর্গা কি টিভি দেখেন?

হে মা দুর্গা,

এবার তুমি নতুন বাঙ্গলায় আসছো মা। তুমি কি টিভি দেখো মা? তুমি কি খবরের কাগজ পড়ার সময় পাও মা? আমি সত্যিই জানি না। তাই তেমায় চিঠি লিখছি। এবার তুমি নতুন বাপের ঘরে আসছ।

কোথায় কী লেখা আছে জানি না কিন্তু আমরা বাঙ্গালিরা তোমায় ঘরের মেয়ে ভেবেই দেবীরূপে পূজা করি। আসলে আমাদের কাছে কন্যাও তো দেবী। কিন্তু মা তুমি কি জানো এই বাঙ্গলা আর সেই বাঙ্গলা নেই। অনেক জমানাই তুমি দেখেছো মা। কিন্তু এ একেবারে অন্য রকম।

আজ বাঙ্গলা এক দেবীর হাতে। কেউ না মানুক তিনি নিজেকে তাই ভাবেন। কিন্তু তোমার ছেলে-মেয়েরা সত্যিই ভালো নেই। নজর করে দেখো সবার চোখেই লুকিয়ে রয়েছে কান্না। সাজগোজ দিয়েও তা হয়তো ঢাকা যাবে না। চারিদিকে চুরি আর চুরি। তুমি বলবে, সে চুরি তো কতই হয়েছে! কিন্তু মা, এমন করে ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ চুরি হয়েছে কি? টাকার বিনিময়ে অযোগ্যরা চাকরি পেয়েছে। তার বিচার আদালত করবে। কিন্তু সেই অযোগ্যরা যাদের শিক্ষক হলেন সেই ছোটোখাটো ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ কে ফিরিয়ে দেবে? যারা যোগ্য মানুষের কাছে শেখার সুযোগটুকুও পেল না! যারা ছোটোবেলাতেই দেখতে পেল তাদের শিক্ষক ঘুষ দিয়ে চাকরি পেল! সেই ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে গর্ব করবে কী নিয়ে! ওদের ভবিষ্যতের আদর্শ কারা হবে মা?

ইউনেস্কো বাঙ্গলার পুজোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তাতেও কৃতিত্বের দাবি নিয়ে লড়াই। রবি ঠাকুরের সেই কবিতাটা মনে পড়ছে। 'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি'...। কিন্তু তুমি তো মা অন্তর্যামী। তুমি জানো কী হয়েছে। আর এটাও জানো যে ছেলে-মেয়েদের চোখের জল থাকলেও তোমায় নিয়ে আদিখ্যেতার মিছিল হয়েছে। আমি জানি মা, তুমি সেটা ভালো ভাবে দেখোনি।

> মা তুমি এসো। এই বাঙ্গলার মঙ্গলকামনা করো। তুমি ক্ষতে ভরা বাঙ্গালির মনের নিরাময় করো। সত্যিই মা, এই বাঙ্গলা তোমায় বড্ডো ভালোবাসে।

তোমায় খুশি করা যায়নি। আজ তুমিও মা 'অনুপ্রাণিত'। মানুষের কষ্টার্জিত করের টাকায় তুমি রাজনীতির হাতিয়ার।

মাগো, আজ যখন এই চিঠি লিখছি তখন চারিদিকে দুর্নীতির পাহাড় সামনে এসে গিয়েছে। আদালতে মামলার পর মামলা। আর সে সব থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতেও তোমাকেই হাতিয়ার করা হয়েছে। তোমার পুজো এগিয়ে এনে সব খারাপ থেকে দৃষ্টি ঘোরানো হচ্ছে। সেটাও ভালো বলে আমি মনে করি। তুমিই তো আলো। বাঙ্গলার এই আঁধারকালে তোমার আগাম আগমন দরকার। মাগো, ওই ছেলে-মেয়েদের কী হবে মা?

পুজোর আগে রাজ্যের দেবী ওঁদের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন। স্বয়ং দেবী দিয়েছেন। ওঁরাও বিশ্বাস ভরে নিয়েছেন। মা, তুমি টিভি দেখ কি না, খবরের কাগজ পড়ো কি না জানি না বলেই বলছি। শয়ে শয়ে ছেলে-মেয়ে ভেবেছিল পুজোর মুখে চাকরি পেয়ে ওরা নতুন জামা কিনবে। মাকে শাড়ি দেবে। বোনকে কানের দুল। যে বাবা বড়ো করেছেন তাঁর হাতে একটা কম দামের হলেও পাঞ্জাবি। কিন্তু ওঁরা জানতে পেরেছে রাজ্যের দেবী ওঁদের ঠকিয়েছেন। দেবীর দেওয়া চাকরির নিয়োগপত্রও আসলে ভুয়ো!

রাজ্যের সর্বত্র পচা গন্ধ বের হচ্ছে মা। তুমি আসার আগে একটু হলেও পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে আদালত। কিন্তু সবটা হবে না মা। পূতিগন্ধময় বাঙ্গলাতেই তোমায় আসতে হবে। এ যে পঞ্জিকা ঠিক করে দিয়েছে। তোমার আগমন যে পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু মা আমি জানি, তুমিও আসতে চাইতে না সব জানলে। আসলে টিভি বা খবরের কাগজ পড়েও যে সব দেখা বা জানা সম্ভব নয়। কারণ, রাজ্যের সর্বশক্তিময়ী দেবী সে সব খবরের প্রকাশ একেবারে পছন্দ করেন না। মা গো, তুমি জানো না রাজ্যে কত কত টাকা গোপনে লুকানো। কিছুটা পাওয়া গিয়েছে। আর তা দেখে বাঙ্গালির গা গুলোচ্ছে। একদিকে টাকার পাহাড়, অন্যদিকে বঞ্চনার পাহাড়।

তবু মা তুমি এসো। এই বাঙ্গলার মঙ্গলকামনা করো। তুমি ক্ষতে ভরা বাঙ্গালির মনের নিরাময় করো। সত্যিই মা, এই বাঙ্গলা তোমায় বড্ডো ভালোবাসে। □

দুর্গাপুজোর নানা রঙের দিনগুলি

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতির স্রোত সদা বহমান। কম্পিউটার লোড করার মতো আজকের দিনের ছেলে-মেয়েরা বুঝতে পারে এর একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে। ওভার লোডেড হয়ে গেলে মুছে যেতে থাকে। কিন্তু বাঙ্গালির কাছে সে যত বড়ো কীর্তিমান বা ছাপোষাই হোক না কেন দুর্গাপুজোর জলছবি তার মনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ল্যামিনেশনে সজ্জিত হয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধিকার পেয়ে গেছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্ভবত 'যাও পাখী' গ্রন্থের শেষাশেষি সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর শরীরে কান পেতে শুনেছিলেন অনাগত সন্তানের অবরুদ্ধ অস্থিরতা। তিনি লিখেছিলেন 'পৃথিবীতে মানুষ কত পুরনো হয়ে গেল তবু মানুষের জন্ম আজও কত রোমাঞ্চকর।

আমরা নিতান্তই ছাপোষা মানুষ। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো না দেখিয়েও চলতে হবে আমাদের। সকলেরই দুর্গোপুজোর স্মৃতি একাধারে রোমাঞ্চকর ও সুখপ্রদ। যা ওই যান্ত্রিক কম্পিউটার ডিলিট করতে অপারগ। আমরা হাওড়াতে ছেলেবেলায় খুব গুলি খেলতাম যাকে বলে মার্বেল। আমাদের ঘুম ভাঙার অভ্যাস ছিল বিলম্বিত। মহালয়ার প্রভাতের দিনটি ছিল একদমই আলাদা। রাত চারটেয় শুরু হয়ে ৫টার কাছাকাছি সময়ে শেষ হওয়ার পর পৃথিবীর প্রত্যুষ বেলা কেমন হয় তা আমরা এই দিনই প্রত্যক্ষ করতাম। সেই হালকা হাওয়ায় কেমন যেন অনির্ণিত এক পবিত্রতার আবহ ছড়ানো থাকতো। সূর্যোদয় স্বাভাবিকভাবেই তখনও হয়নি। কিন্তু সেই উষালগ্নেই শুরু হয়ে যেত গুলি খেলা। বাড়ির পাশেই লম্বা ধরনের

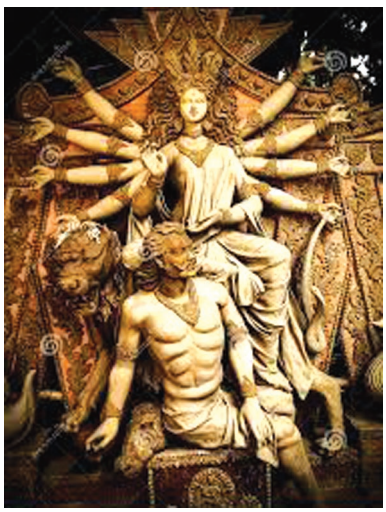

একটা জায়গায় জড়ো হয়ে যেতাম আমরা। সেদিনের সেই সকালবেলায় বন্ধু দের মুখগুলিতে যেন থাকত এক বাড়তি আনন্দের উজ্জ্বলতা।

ঝগড়া হতো কম। এমন সকাল সেই কৈশোর লগ্নে বছরে একবারই আসত। আকাশ ক্রমশ শরৎকালের নিয়মে নীল-সাদা হয়ে উঠত (এখনকার দেওয়ালে দেওয়ালে বহুচর্চিত নীল সাদা নয়)। গন্ধকে যেমন ধরাছোঁয়া যায় না সেই সমাসন্ন দুর্গা-সৌরভও অদৃশ্য হাওয়ায় ভেসে আসত। মনে হতো এর পর শুধুই আনন্দের নিরবচ্ছিন্নতা সমাগত। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথের কথায় বুঝেছি 'আজি শরততপনে প্রভাত স্বপনে কি জানি পরাণ কি যে চায়'। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই অমলিন মহালয়ার সকালগুলি অনির্বচনীয় আনন্দভাণ্ডার নিয়ে জীবনের বহু রুক্ষস্মৃতিতে নির্মল প্রলেপ দিয়ে যাবে।

সে সময় বন্ধুদের মধ্যে খুব চল ছিল ষষ্ঠী-সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত কে কী পরবে তার লিস্ট বানানোর? চার দিনের জন্য চারটে তো মাস্ট। একবার বিশ্বজিৎ-সন্ধ্যা রায়ের 'সরি ম্যাডাম' খুব হিট ছবি হলো। ছবি সাদা কালোয়

হলেও বিশ্বজিতের জামার রং লাল, কলার আর কালো রঙের পকেট। বাজারে হইহই ফেলে দিল। সেই একবারই বাবা ধর্মতলায় তখনকার অভিজাত দোকান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর 'কমলালয়ে' নিয়ে গিয়ে সরি ম্যাডাম কিনে দিলেন। পাড়ায় অষ্টমীর সন্ধ্যায় আমি আর ভাই হলাম জোড়া বিশ্বজিৎ।

সেরা জামা-প্যান্টটা সংরক্ষিত থাকত পটুয়াটোলা কলেজ স্ট্রিটে মাসিমার বাড়ির ২০০ বছরের পুজোর জন্য। সরি ম্যাডামের ধরাচুড়ো সেখানেও চোখ টানলো, তবে একেবারে মধ্য কলকাতা, হওয়ায় আরও বিশ্বজিতদের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। হায়! তখন সবে সন্ধ্যা রায়দের সম্পর্কে কৌতূহলের গোপন বীজ বপন হতে চলেছে। আমাদের কলেজের দিনগুলোতে পুজোর আকর্ষণ তখন পরিধেয় ছাড়িয়ে আরও অগ্রসরমান। সেকালের কোনো বাঙ্গালিই ভুলতে পারবেন না পুজোর গানের জন্য অধীর অপেক্ষা। সাফল্যের শীর্ষচূড়ায় তখন গাইছেন হেমন্ত, মান্না, মানবেন্দ্র, শ্যামল, সন্ধ্যা, আরতি। কখনও কখনও লতা মঙ্গেশকরও পুজোর গান গেয়েছেন। এইচএমভি গানের স্বরলিপি বের করত রেকর্ডের আগে। ষাটের দশকের শেষে আমাদের বন্ধুদের অস্থায়ী পুজো সংখ্যার দোকান বসত। তখন বাড়ির লাগোয়া রক থাকত যা এখনও স্বস্তিকার চার পাশে বহু বাড়িতে আছে। সেখানেই পুজোসংখ্যা, স্বরলিপিকে ঘিরে বসতাম আমরা। ততদিনে সেই ৭০-এর শুরুতে সন্ধ্যা রায়রা অপ্রতিরোধ্য কুহক সৃষ্টি করে ফেলেছেন। তাঁরা বই কিনতে এলে বিক্রেতার সংখ্যা ভয়ানক বেড়ে যেত। প্রথমবার ৬৪ টাকা লাভ হয়েছিল। চার জন বেকারের সেই প্রথম উপার্জন। মা দুর্গার পুজো সংখ্যাই আমাদের প্রথম সাকার করেছিল।

আমাদের কলেজটি ছিল আজকের বহুবাজার অঞ্চলের অচেনা ছানাপট্টিতে। ছিল অজস্র ছানার দোকান যা আজ আর নেই। কলেজের ঠিক পেছনেই ছিল সুনামহীন এক রাস্তা। যেখানে টিফিনের সময় ঘোরাঘুরি করে আমরা একটি কিছুটা ম্যাড়মেড়ে অপরিচিত জগতের বাসিন্দাদের দেখেছিলাম। কিন্তু কলকাতার পুজোর রাত্রের ইন্দ্রজাল একেবারেই নিজস্ব। যেমন নিজস্ব ছিল মাসিমার বাড়ির পুজোর বলির প্রসাদ শুধু হিং দিয়ে রান্না করা কচিপাঁঠার মাংস। তা সত্যিই অনাস্বাদিত। একবার কলেজের বন্ধুরা কয়েকজন ওখানে খাওয়া সেরে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে কৌতূহলবশে কলেজের পেছনের রাস্তাটি অত্যন্ত আলো ঝলমল দেখে ঢুকেছিলাম। ওখানে যাঁরা থাকতেন তাঁদের কাছে অষ্টমীর রাত হোটেল বা ফুচকাওয়ালাদের মতোই মরসুমি দিন। সেদিন আমাদের মতো সদ্য গোঁফ গজানো পর্যটককে তাঁরা অকথ্য গালাগালি দিয়ে ছুটিয়ে ছিলেন। গলি খুঁজি দিয়ে কোনো ক্রমে ট্রামলাইনে এসে পড়েছিলাম। এই রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা আমরা সবাই দেখা হলে এখনও আলোচনা করি।

আরও একটি মোড় ঘোরানো অভিজ্ঞতা এর একটু আগে কৈশোর যৌবনের সন্ধিলগ্নে ঘটেছিল। সেবার ছোটোমামা দিল্লি থেকে পুজোয় এসেছেন। উনি বরাবরই একটু ব্যতিক্রমী প্রকৃতির মানুষ। বললেন জামা কাপড় নিয়ে কী করবি, চল না এবার অনেক বই কিনব। আমাদের বাড়ির লাগোয়া লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়তাম সেটা উনি জানতেন। কলেজ স্ট্রিটে এসে মোটা পাটের দড়ি দিয়ে বইওলাদের মতো ২০/২৫টা বই বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। রোমাঁ রোলাঁর জা ক্রিস্তফ'র দু'খণ্ডে কিশোর সংস্করণ, লাস্ট ডেজ অব পম্পেইস, থ্রিমাসকেটিরার্স, স্পার্টাকাস, লাস্ট অব দি মহিকানস, ভিক্টর হুগোর হাঞ্চব্যাক অব নটরডাম— এমনই কিশোর মনের কাছে অপরিচিত সব কাহিনির দেশ। সবই মূলত সুধীন্দ্রনাথ রাহা বা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বয়সানুগ অপূর্ব বঙ্গানুবাদ। খুলে গিয়েছিল মানুষের ব্যবহার, আচার, আচরণ, ক্রোধ, অভিমান ভালোবাসাকে আমাদের মতো করে জানার এক রুদ্ধ দুয়ার। এও মা দুর্গার দান। পড়ার ইচ্ছেটা এখনও বেঁচে রয়েছে তবে মনে থাকে না।

আসত মহানায়ক উত্তম কুমারের সিনেমা, সঙ্গে তাঁর সার্থক সঙ্গিনী বাঙ্গালির সৌন্দর্য সংজ্ঞার দুই অপরূপ রূপকল্প। তাঁদের সেরা ছবিগুলিই পুজো মুক্তির জন্য চিহ্নিত থাকত। প্রেক্ষাগৃহগুলি কানায় কানায় পূর্ণ। এ Plaza-র ডিজিটাল বুকিং নয়। অনেকে টিকিট কাটতে গিয়ে হাত-পা ভেঙে টিকিট নিয়ে বীরদর্পে ফিরতেন। পুজোর রেকর্ডে যখন মানবেন্দ্র গাইছেন 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি' তখন হলগুলি কাঁপছে অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী, দেওয়া নেওয়া বা শঙ্খবেলার আনবিক আক্রমণে। হলে আবার এখনকার একটা কিনলে একটা ফ্রি-র মতন নয়, নিখরচায় অজস্র অপরূপা সন্দর্শনের সুযোগ। চারদিক ঝলমল করত এই চিরন্তনী আবেগময়তার আনন্দস্রোতে যা আজও বহমান। হয়তো আজকের পারমিসিভ সোসাইটিতে চলমান দুর্গা আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টার নানা কৌশল বেড়েছে।

অনেকের মনে পড়বে অধুনালুপ্ত firebrigade-এর পুজোয় প্রথম দুর্গা চিত্রকল্পের মৌলিক পরিবর্তন। কুমারটুলির অসাধারণ সৃস্টি অস্ত্র-সমর্পিত অসুরের করুণ মুখচ্ছবি। সে মা দুর্গার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। সারা বাঙ্গলা তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল এই ঠাকুর দেখবার জন্য। কয়েকবছর ক্যালেন্ডারেও শোভা পেত এই আত্মসমর্পণের দৃশ্য।

এ সূত্রে অসুর কেন, একধরনের অধ্যাত্মিক সমর্পণ বহু আগেই করে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ— ''ঘরে ঘরে দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দ প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে আমার ধর্মসংস্কারের বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে... শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা সমস্তটা মিলে মনের মধ্যে আনন্দকাব্য রচনা করে।' কয়েক পুরুষের ব্রাহ্ম তিনি বলে গেছেন— 'যাকে দূর থেকে সামান্য পুতুল বলে মনে হয়... কিন্তু সমস্ত দেশের মনে যাতে একটা ভাবের আন্দোলন এনে দেয় তা কি কখনও নিষ্ফল হতে পারে?'' (ছিন্নপত্র)। দুর্গাপূজা বহুস্তরীয় আনন্দের এক আয়োজন। পুজো চলে গেলেও পরের বছর অবধি মনের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে সেখানে টোকা দিলেই সুখ উপচে বৃষ্টি হয়। মাকে প্রণাম। □

পাত্রী চাই

মধুকল্য, এদেশীয়, ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, ২৬, পল সায়েন্স (অনা), কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমা, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মী, পূর্ব মেদিনীপুরে নিজস্ব জমি, বাড়ি, পাত্রের জন্য ধার্মিক, সৎ, পবিত্র পরিবারের সুন্দর, সুস্বাস্থ্য, ১৮-২৩ বয়স্কা, কমপক্ষে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি পাত্রী চাই। কোনো দাবি নেই।
যোগাযোগ : ৬২৯৬৮৯৩৯১৮

চকচকে মণ্ডপে ম্রিয়মাণ ভক্ত

নিখিল চিত্রকর

কয়েক দশক আগের কথা। তখন ক্লাবকর্তাদের অনুরোধ রাখতে গিয়ে আতান্তরে পড়তে হতো পোটোপাড়ার শিল্পীদের। নানারকম বায়নাক্কা সামলে প্রতিমা গড়তেন তখনকার সনাতন বা সুকুমার পালেরা। সেই মতো কোথাও মা দুগ্গার মুখ হতো হেমা মালিনীর মতো। আবার কোথাও মহিষাসুরকে দেখে মনে হতো অবিকল মি.-ইন্ডিয়া সিনেমার মোক্যান্ত্রোর মতো।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চাহিদা বদলেছে পুজো কর্তাদের। ছোটো থেকে পেল্লায় বড়ো হতে থাকা পাড়ার পুজোগুলোতে একসময় রাজনীতির রং লাগতে শুরু করল। অমুক দাদার পুজোর ঝাড়বাতির আকর্ষণে সারারাত লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো বাঙ্গালি। তমুক দাদাও কম যান না। সাবমেরিনের আদলে মস্ত পুজোমণ্ডপ করে তাক লাগিয়ে দিলেন। থিম পুজোর সেই শুরু। একমাত্র কলেজ স্কোয়ারের পুজো বাদ দিলে হালফিলে কলকাতার প্রায় সব পুজোই থিমের মোড়কে বাঁধানো। গ্রামবাঙ্গলার পুজোগুলোও আজকাল থিমের বাইরে অন্য কিছু ভাবতে পারে না। সেখানে আবার কোটি কোটি টাকার লগ্নি। কর্পোরেট সংস্থার স্পনসরশিপ। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির তারকাখচিত বিজ্ঞাপন। হইহই রইরই কাণ্ড!

তা, এতবড়ো দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার যখন তা তো আর পাড়ার ক্লাবের তালপাতার সেপাইদের দিয়ে চলে না। তাই সময় ঘুরে সেসব পুজোর রাশ হাতে নিলেন দাদারা। থুড়ি রাজনৈতিক দাদারা। এ রাজ্যের বামদলের নেতা-মন্ত্রীরা মার্কস দলিলের মর্যাদা রেখে ওসব পুজোটুজো নিয়ে মাথায় ঘামানয়নি। সে সবের নিয়ন্ত্রণ আগাগোড়াই ছিল কংগ্রেস ও পরে তৃণমূলের হাতে। বামেরা লালবাড়ি থেকে বিদায় নিল। গঙ্গাপারের নীলসাদা বাড়িতে এল তৃণমূল। সেদিনের নেতাদের কেউ বিধায়ক, কেউ সাংসদ আবার কেউ মন্ত্রী হলেন। পদোন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের পুজোরও শ্রীবৃদ্ধি হলো। সেই সময় আবার চিট ফান্ডের রমরমা। সুদীপ্ত সেন, অনুকূল মাইতি, গৌতম কুণ্ডু, রামেন্দু চ্যাটার্জিরা সব এক একজন দাদার পুজোয় দেদার টাকা ঢালার দায়িত্ব নিয়ে নিল। এ যেন ফোকট কা মাল দরিয়া মে ডাল। দাদাদের বাহুবল বাড়তে বাড়তে তখন ছাদচুম্বী। এ রাজ্যে চিটফান্ডের বাজার গুটিয়ে যাওয়ার পর গোড়ায় থিমপুজোর জৌলুসে খানিকটা খামতি এলেও রাজনৈতিক বদান্যতায় সেগুলো আবার নিজস্ব ফর্মে ফিরে এসেছে।

অবিশ্যি বড়ো বড়ো পুজোর বদান্যতায় আর্ট কলেজের পাশ দেওয়া শিল্পীরা খানিক স্বনাম খ্যাত হয়েছেন। আর কিছু না হোক বাঙ্গালি সেইসব থিম শিল্পীর নাম গড় গড় করে মুখস্থ বলে দিতে পারে। থিম পুজোর খাতিরে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা হয়েছেন নিরস্ত্র। অসুর তার কিম্ভূতকিমাকার বদন ছেড়ে ডানা লাগিয়ে প্রণাম করার কায়দা শিখেছে। কোথাও আলোআঁধারি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট মণ্ডপে মা দুর্গা ভাসমান। পাথরের প্রতিমায় জীবন্ত ত্রিনয়ন। বাহুবলী সিনেমার মাহিষ্মতী'র রাজপ্রসাদ। ১০০ কেজি ওজনের সোনার গয়নায় ভূষিতা উমা, আরও কত কী! তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে এখন। দেদার বিনোদনের সবটাই ঢালাও করে সাজিয়ে রাখা হয় এখানে। শুধু ভক্তিটাই উহ্য।

এই নিখাদ বিনোদনের দায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন বাহুবলী রাজনৈতিক দাদাভাইরা। তবে এক দলের হলেও তাদের মধ্যে ঠাণ্ডা প্রতিযোগিতাও রয়েছে। এই তো সেবছর দেশপ্রিয় পার্কে 'সব চেয়ে বড়ো দুর্গা' করে সারা রাজ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তখনকার এক কাউন্সিলরের ভাই (এখন বিধায়ক)। তার পুজোয় জনসমুদ্রের ঢেউ যখন আছড়ে পড়ছে, ঠিক সেই সময়েই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। আর দুর্ঘটনার পর প্রশাসন এসে তালা দিল পুজোর দোর গোড়ায়। তা নিয়ে মুচকি হাসল চেতলা, শ্রীভূমি সুরুচি সঙ্ঘ। আবার গত বছর যখন শ্রীভূমির বুর্জ খলিফায় লাগাম দিল পুলিশ, দেশপ্রিয় পার্ক মনে মনে বলল 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।' এভাবেই ঝাঁ-চকচকে, পালিশ করা, অকাশচুম্বী শিল্পের বহরে বাহুবলীদের পুজোর প্রোমোশন পাচ্ছে ফি বছর। মানুষ ধন্য ধন্য করছে। সব বিষণ্ণতা কাটিয়ে পাহাড় জঙ্গল, নদীর সঙ্গে হাসছেন সরকার বাহাদুরও। তাদের ধারণা এই বাহুবলের প্রতিযোগিতাই সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে কলকাতার গলায় স্বীকৃতির মেডেল ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। এতেই বোধহয় বাইসেপের গুলি বাড়ল আরও দুই ইঞ্চি।

রূপনারায়ণের ঘাটে শচীনকত্তার গান

সন্দীপ চক্রবর্তী

বাগনান থেকে কোলাঘাটের বাস ছাড়ে। কথাটা মনে পড়ামাত্র মাথায় একটা খেয়াল চাপল। নেমে পড়লাম ট্রেন থেকে। এই মহাজন একবার বলেছিলেন, 'বুদ্ধিমান হওয়া ভালো। কিন্তু মাঝে মাঝে নির্বোধ হয়ে গেলে তাতে লাভ বই ক্ষতি হয় না!' মহাজনবাক্য অস্বীকার করবার মতো নয়। মনের মধ্যে সামান্য খচখচানি যে নেই তা নয়। ট্রেনে জানলার ধারে চমৎকার সিট পাওয়া গিয়েছিল। পুজোর দু' সপ্তাহ আগে বাঙ্গলার প্রকৃতিও হাওয়া আর কাশফুলের নৈবেদ্য সাজিয়ে মনপ্রাণ টেনে নিয়ে গিয়েছিল আলোকবর্ষ দূরের কোনও গ্রহে। বাগনানের পর মাত্র দুটো স্টেশন— তারপরই কোলাঘাট। ট্রেন সেখানে নিজের নিয়মেই পৌঁছত। তবুও নেমে পড়লাম। দেখা যাক লাভ হয় কি না!

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডে পা রাখার ঠিক আগে আলাপ হলো কেষ্টবাবুর সঙ্গে। ভবঘুরে টাইপের চেহারা হলেও ভবঘুরে নন। বীরশিবপুরে বাড়ি। আগে বাগনানের একটা কাপড়ের দোকানে চাকরি করতেন। কোভিডের পর আপাতত বেকার। তাই বলে একেবারেই কোনও কাজকর্ম করেন না, তা নয়। সে কাজে হয়তো টাকাপয়সা রোজগার হয় না কিন্তু সময় কাটে, পাঁচরকম মানুষের সঙ্গে কথা বলে মনও শান্তি পায়। সাতসকালেই বাগনান বাসস্ট্যান্ডে চলে আসেন কেষ্টবাবু। তারপর দূরদূরান্ত থেকে আসা যাত্রীরা কে কোথায় যাবে শুনে কোন বাসে গেলে তাদের সুবিধে হবে বলে দেন। ট্রেন থেকে নেমে বাসে কোলাঘাটে যাব বলে ঠিক করেছি শুনে আমাকে তো রীতিমতো ধমকই দিলেন, 'ছি ছি, এমন ভুল কেউ করে? ট্রেনে গেলে কত আরামে যেতেন বলুন তো! বাসে ভিড় হবে, তার ওপর... যাক, ভুল যখন হয়েই গেছে তো আর ভেবে লাভ নেই। আপনি ওই চৈতন্যমহাপ্রভু লেখা বাসটায় উঠে পড়ুন। —কোলাঘাটে নামিয়ে দিবি।'

ভুল করার পরের অভিজ্ঞতাটা মন্দ হলো না। ভারতবর্ষ নামক দেশটির আনাচেকানাচে রহস্য। আর প্রতিটি রহস্যের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। তাদের ছোটো-বড়ো সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মান-অভিমান--- এমনকী আপাতবিচারে নির্বুদ্ধিতাও এই রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে। কেষ্টবাবুর মতো মানুষ কি অন্য কোনও দেশে পাওয়া যাবে? বোধহয় না। বিশ্বের ধনী দেশগুলিতে যারা থাকেন, সোনারুপোয় তৈরি খাবার খান--- তারা বিশ্বাসই করতে পারবেন না যে এমন কোনও মানুষও এই পৃথিবীতে থাকতে পারেন যিনি চাকরিবাকরি হারিয়ে নতুন চাকরি না খুঁজে সাতসকালে বাগনান বাসস্ট্যান্ডে চলে আসেন এবং যাত্রীদের গন্তব্য জেনে নিয়ে তাদের সঠিক বাসে তুলে দেন। ইকড়ি-মিকড়ি ছক কাটা জীবনে যারা রাজার রাজা হয়ে বসে থাকেন তাদের পক্ষে এমন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর গল্প বিশ্বাস করা কঠিন। তারা হয়তো কেষ্টবাবুকে নির্বোধ বলবেন, সুবিধেবাদীও বলতে পারেন। কিন্তু মানুষের বিচার আর ঈশ্বরের বিচার এক হয় না। কেষ্টবাবুর তিন অগ্রজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত। অভাব বলতে যা বোঝায় তা নেই। কিন্তু সম্পন্ন হলেই কি নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায়? কেষ্টবাবু পেরেছেন, কারণ তাঁর দাদারা সন্ন্যাসী-স্বভাব ছোটোভাইটির জীবনকে অ্যাকাউন্টেন্সির জাবদা খাতা বানাতে চাননি। কেষ্টবাবুও এই বদান্যতাকে সানন্দে গ্রহণ করে সেই কাজ করছেন যা কেউ করবে না। এমনকী, করার কথা ভাববেও না।

চৈতন্য মহাপ্রভু যথাসময়ে যাত্রা শুরু করলেন। বাসে ঠাসাঠাসি ভিড়। তবে শুধু মানুষ নয়, দুটি ছাগলও আমাদের সঙ্গী হয়েছে। এক বৃদ্ধা ছাগলদুটিকে কোলের কাছে নিয়ে বসে আছেন। এখানে যাদের বাসে যাতায়াত

তারা সকলেই এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে পরিচিত। কেউই কিছু বলছেন না। ছাগলদুটি অম্লান বদলে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের জিনিসপত্র চিবনোর চেষ্টা করছে। একজনের হাতে রোল করে রাখা কাগজ একটি ছাগলের হঠাৎ খুব পছন্দ হয়ে যাওয়ায় তিনি ধমক দিলেন। আমার পাশে বসা অল্পবয়েসি ছেলেটি বলল, 'বাসে ছাগল নিয়ে উঠেছ কেন ঠাকুমা? এটা তো মানুষের যাতায়াত করার বাস।' বৃদ্ধা হেসে বললেন, 'ছাগলও তো মানুষের বাবা। আমি খেতে পাব আর ওরা পাবে না, তা কি হয়?' গৃহপালিত জীবদুটির জন্য অদ্ভুত এক মায়া ফুটে উঠল বৃদ্ধার চোখে। মনে হলো এও ভারতবর্ষের সনাতনী শিক্ষা। এই দেশ যেন বলতে চায়, যাকে তুমি তার স্বাভাবিক বিচরণভূমি থেকে তুলে এনে নিজের কাছে রেখে পালন করছ তাকে নিছক পশু ভেবে করুণা করলে তোমার অন্তর্নিহিত মাতৃত্বকেই অসম্মান করা হয়। তুমি যেমন ঈশ্বরের সৃষ্টি, ওরাও তাই। তুমি ওদের পালন করছ মানে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে পালন করছ।

কোলাঘাট বাস থেকে নামার পর মনে পড়ে গেল রূপনারায়ণ নদীর কথা। আসার সময় ব্রিজ থেকে দেখেছি কিন্তু তাতে মন ভরেনি। দৈর্ঘ্যে না হলেও চওড়ায় এত বিশাল নদী পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি নেই। বিশেষ করে কোলাঘাটে রূপনারায়ণ যেন চুপনারায়ণ। ইঁদুর দৌড়ে জিতে যারা নিজেদের হিমালয়ের সমান ভাবতে শুরু করেন তাদের অনেককেই দেখেছি অপার-অকূল রূপনারায়ণের সামনে দাঁড়িয়ে চুপ করে যেতে। তাঁরা সকলেই শহরের উঁচুমহলের মানুষ। অশিক্ষার ঘুণপোকা তাঁদের জীবনের আনাচে কানাচে বাসা বাঁধলেও তাঁরা উচ্চগ্রামে ডিগ্রি-ডিপ্লোমার বড়াই করেন। গলায় বিদেশি ইউনিভার্সিটির বকলমের অহংকারে তাদের মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু দিগন্ত পেরিয়ে ছুটে আসা উতল হাওয়ার সঙ্গে দুষ্টুমি করা রূপনারায়ণের কাছে এসে তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁদের স্টেটাস এই খ্যাপা জলরাশির দৃষ্টিতে একটা কাগজের নৌকোর থেকে বেশি নয়।

আমি অবশ্য স্টেটাসফেটাসের ধার ধারি না। আমার সব সম্পদই যিনি আমাকে চালান, তাঁর। শুধু মানুষ দেখব বলে বারবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। এবং তিনি একের পর এক মানুষ মিলিয়েও দেন। কোলাঘাট যাঁর কাছে এসেছি তাঁর নাম প্রসূন হালদার। সজ্জন, সচ্চরিত্র। আদতে হুগলী জেলার মানুষ কিন্তু কোলাঘাটের স্কুলে শিক্ষকতা করেন বলে এখানকার মানুষ হয়ে গেছেন। প্রসূনের সঙ্গে আলাপ আমার একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে। ঘণ্টাখানেক চায়ের আড্ডার পর সেদিন প্রসূন আমাকে প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন, 'আপনি তো নদী ভালোবাসেন। একবার কোলাঘাটে আসুন না। রূপনারায়ণকে ভুলতে পারবেন না।' শাকের ক্ষেত দেখার পর কাঙাল আর কী করে! তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম। যদিও কোলাঘাটে আগে কয়েকবার গেছি। রূপনারায়ণকেও দেখেছি। তবুও, অধিকন্তু ন দোষায়!

ধুলো পায়ে রূপনারায়ণ দেখে উপস্থিত হলাম প্রসূনের বাড়িতে। প্রসূন তো খুব খুশি। কী করবেন আর কী করবেন না বুঝতে পারছেন না। প্রসূনের স্ত্রী মিতাও চমৎকার মেয়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম.এ পাশ করেছেন। রান্নার হাতও সুস্বাদু। কিন্তু এসব মিতার গলায় রবীন্দ্রসংগীতের কাছে কিছুই নয়। সেদিন মিতার গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে এক পরম রমণীয় অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে দুপুরে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টির অনুষঙ্গে মিতার গলায়, 'এমন দিনে তারে বলা যায়...'— অনেকদিন মনে থাকবে।

প্রসূন বেশ কাজের ছেলে। আমার খেয়ালখুশির খবর রাখে। লাঞ্চের পর বললেন, 'আজ একটা স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। বিকেলে রূপনারায়ণে বোটিং করব। আমি আপনি আর মিতা।' আমার তো হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। এমন একটা ইচ্ছে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারিনি। কোথায় যেন একটা সংকোচ ছিল। প্রসূনের সঙ্গে পরিচয় তো বেশিদিনের নয়। এখনই ওর ওপর ইচ্ছে-অনিচ্ছে চাপিয়ে দিলে হয়তো কিছু মনে করবে। কিন্তু এখন দেখছি সংকোচ করে ঠিক করিনি। মনের খোঁজ মন ঠিকই রাখে। প্রসূন মন দিয়েই বুঝেছেন যে আমি শুধু রূপনারায়ণকে আলগোছে দেখতে আসিনি। ডুব দিতে এসেছি। রূপের গহনে না পৌঁছতে পারলে ডুব দেওয়া হয় কীকরে!

বিকেল-বিকেল ঘাটে পৌঁছে গেলাম। সিঁদুরের রং লেগেছে আকাশে। সঙ্গে মন কেমন করা হাওয়া। আসার সময় রাস্তায় রাস্তায় দেখে এসেছি মা দুর্গার জন্য মণ্ডপ বাঁধা হচ্ছে। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরবে তার আনন্দ শিউলির মতো সুগন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। আর আমরা এই শুভক্ষণে নৌকোয় উঠছি। মাঝির বয়েস অল্পই। বড়োজোর তেইশ-চব্বিশ। নাম হাবুল। হাবুলের বিশেষত্ব হলো সবসময়েই একটা সুর গুনগুন করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি বুঝি গান গাইতে পারো?' হাবুল কিছু বলল না। গুনগুনও থামল না। মিতা বললেন, 'কী গাইছ আমাদের শোনাবে না?' এবারও কোনও জবাব নেই। ভাবলাম, যাক। হয়তো লজ্জা পাচ্ছে। আমাদের তো চেনে না। গান নিয়ে আর কোনও কথা হয়নি। ততক্ষণে আমার মনপ্রাণ দখল করেছে রূপনারায়ণ। তার ঘোলা জল তখন আয়নার মতো স্বচ্ছ। হাত বাড়ালেই মুখ দেখা যায়। আর দেখা যায় রূপনারয়ণের মন। চোখ পড়ে গেল দূরে। নৌকোয় করে দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে আসা হচ্ছে। অস্তরাগের আলোয় বড়ো মায়াময় লাগছে দুর্গাকে। যেন দেবী নয়, মা নয়, অনেক দূরে বিয়ে হওয়া মেয়ে ঘরে ফিরছে পুজোর ছুটিতে। প্রতিমার নৌকো আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় দেখলাম হাবুল হাতজোড় করে প্রণাম করছে।

চলে গেল নৌকো। মিলিয়ে গেল দিগন্তে। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে আমরা যখন ডুবে গেছি ঠিক তখনই কানে এল হাবুলের গলা, 'কে যাস রে, ভাটিগাং বাইয়া...'। শচীনকত্তার গান গাইছে হাবুল। আমাদের স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ একাকার করে দিচ্ছে। দেখলাম রূপনারায়ণ ঢেউয়ের পর ঢেউ দিয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাদের নৌকোটি। যেন আদর করতে চাইছে হাবুলকে। রূপনারায়ণেরও কি ভালো লেগেছে হাবুলের গান? তারও কি কেউ হারিয়ে গিয়েছিল? শচীনকত্তা যাকে ধরে রেখেছেন তার গানে। আর আজ হাবুল আবার ফিরিয়ে দিল রূপনারায়ণের কাছে। গান শেষে আমাদের কারোর মুখে কথা নেই। মিতার চোখে জল। প্রসূন হতবাক। আর আমি শুধু চেয়ে আছি একরত্তি ছেলেটার মুখের দিকে। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত ভালো গান কার কাছে শিখলে হাবুল?' হাবুল অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বলল, 'রূপনারায়ণের কাছে!' □

শ্রীদুর্গানাম ভুলো না মন

রামানুজ গোস্বামী

এই বাঙ্গলার কবি ও গীতিকার এক সময় গান বেঁধেছিলেন এই বলে যে, 'দুর্গা নাম জপ সদা রসনা আমার'। কেউ-বা লিখেছেন, 'অভয়ার সভয়পদ কর মন সার'। শাক্তকবি মাতৃসাধক রামপ্রসাদ লিখলেন— 'শ্রীদুর্গা নাম ভুলো না মন'। দুর্গা-নাম হলো মহামন্ত্রস্বরূপ। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে বহু দেব-দেবীর অসংখ্য মন্ত্র। এই সকল মন্ত্রের কোনোটি একাক্ষরী, কোনোটি পঞ্চাক্ষরযুক্ত, আবার কোনোটি-বা দ্বাদশ অক্ষর বিশিষ্ট ইত্যাদি। আসলে দেব-দেবীর রূপ তথা মহিমা যেমন ভাবে সাধকের কাছে প্রতিভাত হয়েছে, সেই ভাবেই এই মন্ত্রাদিরও সৃষ্টি হয়েছে। তবে মন্ত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরও বহু ব্যাখ্যা রয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হলো দুর্গা-নাম ও তার মহিমা। বৈদিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি সমস্ত মতানুসারেই দুর্গা-নামই হলো একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রকে কেউ কেউ মন্ত্ররাজ বলেও অভিহিত করে থাকেন। মন্ত্ররাজ বলতে বোঝায় যে, এই মন্ত্র হলো সকল মন্ত্রের অধিপতি তথা প্রধান। দেব-দেবীর মন্ত্র উচ্চারণ করতে হলে আদিতে বা অন্তে বিভিন্ন প্রকার বীজমন্ত্র, প্রণব কিংবা স্বাহা ইত্যাদি শব্দ নিয়োগ করতে হয়। এই নিয়ম মেনেই মন্ত্রদীক্ষা দেওয়া হয়, এই নিয়ম মেনেই মন্ত্রজপও করতে হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে তাতে মন্ত্রজপ ঠিকমতো করা হয় না বলেই শাস্ত্রের অভিমত। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো দুর্গানাম না দুর্গানাম-মহামন্ত্র। এই মন্ত্রকে সর্বশাস্ত্রসার, সর্ববেদসার, সর্বতন্ত্রসার বলেও ব্যাখ্যা করা হয়। কারণ, এর মধ্যেই নিহিত আছে সমস্ত শাস্ত্রের মূল সত্য। আদ্যাশক্তি, পরমাপ্রকৃতি দুর্গাদেবীর নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই জাপকের হৃদয়ে জগজ্জননীর পরমতত্ত্বের জ্ঞান অনায়াসেই উপলব্ধ হয়ে থাকে। এর জন্য তাই জাপককে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করতেও হয় না। দুর্গাদেবীর নাম-মাহাত্ম্য এমনই।

যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ ও মহাত্মা এই দুর্গানামের মহিমা নানাভাবে বর্ণন বা কীর্তন করেছেন। আজও দুর্গাপুজোর সময়ে পুজোর সংকল্পের পাশাপাশি দুর্গানাম জপের সংকল্পও করার বিধান রয়েছে। বস্তুত শাস্ত্রমতে যে ব্যক্তি পূজা-পাঠ, হোম-যজ্ঞ, তর্পণ ইত্যাদিতে অসমর্থ, সে শুধুমাত্র জপের দ্বারাই

সর্বপ্রকারের পূজার্চনা, হোম-যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ ও তর্পণাদির ফললাভ করতে সক্ষম হয় এবং সাধু-মহাত্মা ও সিদ্ধপুরুষেরা এই কথাই বলেছেন যে, ‘জপাৎ সিদ্ধি’। তাই যে কোনো মানুষই, সমস্ত দেবতার দ্বারা পূজিত ও বন্দিত দুর্গানাম জপ করে ধর্ম-অর্থ-কাম-ক্রোধ চারপ্রকার পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হতে পারেন, এতে কোনো সংশয়ের অবকাশই নেই।

মৎস্যসূক্তে বলা হয়েছে যে, দেবীগণের মধ্যে দুর্গাদেবীই প্রধান। তাঁর নাম-মহিমা বা নাম-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, দেবী তাঁর ভক্তকে সর্বপ্রকারের দুর্গতি থেকে মুক্ত করেন। সেইসঙ্গে ত্রিতাপ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিঘ্নসমূহকেও তৎক্ষণাৎ নাশ করে দেন। তাই বলা হয়েছে যে—

‘নহি দুর্গাসমা পূজা নহি দুর্গাসমং ফলং।

নহি দুর্গাসমং জ্ঞানং নহি দুর্গাসম তপঃ’।।

পুরাকালে নৃপতিরা অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করতেন। বর্তমান কালে, অশ্বমেধযজ্ঞই হলো দুর্গাপুজো। যেস্থানে দেবীর নামস্মরণ করা হয়, সেইস্থান কৈলাসের সমতুল্য পবিত্র হয়ে যায়। এমন কোনো কার্য নেই যা দেবী দুর্গার নাম স্মরণে সিদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি ঐহিক উন্নতি চায়, সে দেবীর নাম জপ করে তা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কেউ যদি পারমার্থিক উন্নতি লাভে সচেষ্ট হয়, তবে তারও একান্ত কর্তব্য হলো দুর্গানাম জপ করা। কারণ, এর ফলেই সে এই জীবনেই মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করতে পারে।

শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সর্বদাই দুর্গনামে চিত্তকে নিবিষ্ট করে রাখতে সমর্থ, সে সাক্ষাৎ শিবতুল্য হয়ে যায়। মহারোগ, মহাভয়, মহাবিপদ, মহাদুঃখ ও মহাশোক প্রভৃতি সব কিছুই ভস্মীভূত হয়ে যায় দেবী দুর্গার নাম জপের ফলে। দেবীর ভক্ত সদাসর্বদাই অপরাজেয় হয়েই থাকে। সমস্ত বিদ্যাই হয় সেই সাধকের করায়ত্ত। তাই বলা হয়েছে যে— ‘দুর্গানাম মহামন্ত্রঃ সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ’।

এমন কোনো বিপদ নেই, যা দুর্গানাম স্মরণে দূরীভূত না হয় অর্থাৎ সমস্ত বিপদই চিরতরে দূরীভূত হয়ে যায়। এমন কোনো পাপী নেই, যে দুর্গানাম গ্রহণে পুণ্যাত্মায় পরিণত না হয় অর্থাৎ সমস্ত পাপীরা দেবী দুর্গাকে স্মরণ করে পুণ্যবান হতে সমর্থ হবে, এটাই শাস্ত্রের ঘোষণা। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সমস্ত বৈদিক সাহিত্য ও বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠের যে ফল, তার থেকেও দুর্গানাম জপের ফল বহুগুণ বেশি। এমনকী সমস্ত তীর্থদর্শনের ফল লাভ করা যায় এই দুর্গানাম জপ করেই। যে ব্যক্তি প্রত্যহ দেবী দুর্গার নাম জপ করে থাকে, তার সর্বাভীষ্টই দেবী পূর্ণ করে থাকেন। বিশেষত, নবরাত্রি তথা দুর্গাপূজার সময়ে তো এই নামজপের মহিমা বর্ণনাতীত। সেই সময়ে যদি কেউ দুর্গানাম জপ করতে পারে, তো সে দেবীর বিশেষ কৃপার অধিকারী হতে সক্ষম হয়। তাই মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো নবরাত্রি ও দুর্গাপূজায় ঐকান্তিক ভাবে দুর্গানামজপে ব্রতী হওয়া। এক্ষেত্রে, শাস্ত্রে লিখিত জনেরও বিধান পাওয়া যায়।

তন্ত্রমতে বলা হয়েছে যে, এই নামমন্ত্র এমনই ফলদায়ক যে, যে কোনো কাজের সময়, চলতে-ফিরতেও মানুষ দেবীর এই নামমন্ত্র জপ বা স্মরণ করতে পারে। এতে জপের কোনো হানি হয় না। বরং সমস্ত কাজেই যদি দুর্গানাম জপ করতে থাকা হয়, তবে যে ব্যক্তি জপ করছে, তার উপরে দেবীর আশীর্বাদ শতগুণে বর্ষিত হয় এবং তার সকল কর্মই সফল হয়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই কোনো স্থানে যাত্রা করবার প্রাক্কালে দুর্গানাম স্মরণ করবার যে রীতি আছে। এর নেপথ্যে যে ব্যাখ্যা আছে, তা হলো—

‘দুর্গা দুর্গা বলে যেজন যাত্রা করে যায়,

শূল হস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়’।

সুতরাং এটা বুঝতে কোনো অসুবিধেই হয় না যে, দুর্গানাম হলো সেই মহামন্ত্র, যে মন্ত্র জপে মানুষ যা প্রার্থনা করে তাই পেতে পারে; তবে তা ন্যায়সঙ্গত বা ধর্মসঙ্গত হওয়া দরকার। দেবতারাও অসুরদের দ্বারা বিপর্যস্ত হলে সেই পরমেশ্বরী দুর্গাদেবীরই শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। তাই আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, ঐকান্তিক বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহযোগে দেবী দুর্গার আরাধনা ও নামজপে রত হওয়া। □

দুর্গাপুজোয় আনন্দে মেতে ওঠে ঢাকা শহর

জীবন কুমার রায়

আকাশে-বাতাসে এখন দুর্গাপুজোর শিহরণ। শিল্পী তুলির নিপুণ আঁচড়ে উদ্ভাসিত করে তুলেছে দেবী প্রতিমাকে। দেবী দুর্গা ঢাকায় ঠিক কবে বারোয়ারি মণ্ডপে এসেছিল তা নিয়ে অবশ্য নানা মত পাওয়া যায়। কেউ বলেন বল্লাল সেন চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈরি করেন ঢাকেশ্বরী মন্দির। তবে বল্লাল সেনের ঢাকেশ্বরী মন্দির তৈরির ঘটনা এখনও প্রমাণিত নয়। ঢাকার দুর্গাপূজার সবচেয়ে পুরোনো তথ্য পাওয়া যায় অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের আত্মজীবনী থেকে। ১৮৩০ সালের সূত্রাপুরের একটি পূজার উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রায় দোতলা সমান উঁচু ছিল দুর্গা প্রতিমাটি। সে সময়ে নন্দলালবাবুর বাড়িতে পূজাটি হয়েছিল। এছাড়াও ইতিহাস বলে, ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের পূজাও এক সময় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

১৯৭১-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিংবদন্তী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে শুরু হয় দেশের কেন্দ্রীয় দুর্গা পূজা। রাজধানী ঢাকায় প্রতিবারের মতো এবারও দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাজধানীতে প্রায় ২৩৫টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে আদি ঢাকার সূত্রাপুর থানায় সবচেয়ে বেশি, ৪০টি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ঢাকার অন্যান্য পূজামণ্ডপেও চলে নানা আয়োজন। পুরনো ঢাকার পূজা মানেই অন্য সব পূজার চেয়ে একটু আলাদা। পুরনো ঢাকার তাঁতিবাজার আর শাঁখারি বাজারের দুর্গাপূজা বাংলাদেশের অন্য সব পূজার চেয়ে বেশ অনন্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। শাঁখারি আর তাঁতিবাজারের রাস্তাগুলো তেমন প্রশস্ত নয়। বড়োজোর দশ-পনেরো ফুটের রাস্তা। সেই রাস্তার উপরেই নির্মিত হয় বাঁশ কাঠের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ অস্থায়ী মণ্ডপ। এখানে বিশ থেকে পঁচিশটির মতো পূজা হয়। বাংলাদেশের কোথাও এক জায়গায় এতগুলো পূজার আয়োজন করা হয় না। মণ্ডপগুলো রাস্তা থেকে বেশ উঁচুতে তৈরি করা হয়। বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে থেকে দশ-পনেরো ফুট চওড়া গলিতে ঢুকে যেতে হয়। মণ্ডপের নীচে দর্শনার্থীদের হাঁটার পথ। চারদিকে বাজতে থাকে ঢাক-ঢোল-সহ নানা বাদ্যযন্ত্র, আবার কোথাও কোথাও চলে মাইকে বিরামহীন গানের ছন্দ। ধর্ম বা বর্ণের ভেদ নেই দর্শনার্থীদের মাঝে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরত্বে একটা পর একটা পূজার দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না অনেক দর্শনার্থীই। এছাড়া ঢাকেশ্বরী মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি, রামকৃষ্ণ মিশন, রমনা কালীবাড়ি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ঐতিহ্যবাহী পূজার পাশাপাশি কলাবাগান উওরা, কাওরান বাজার মিডিয়া পাড়া ও বনানীর পূজায় মিশেছে আধুনিকতার এক অপূর্ব সংযোজন।

মায়ের আগমনে এখানে হিন্দুদের মধ্যে যেমন আনন্দ বিরাজ করে, তেমনি ভয়ও ঘিরে রাখে। গত বছর দুর্গা পূজার সময় কুমিল্লায় নানুয়ারদিঘি এলাকার একটি পূজা মণ্ডপের প্রতিমায় কোরান রাখার খবর ছড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে ধর্ম অবমাননার দায়ে কুমিল্লা, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ, রংপুরে মন্দির ভাঙচুর, হিন্দু বাড়িতে অগ্নি সংযোগ ও আক্রমণ ৫ জন মারা যায়। এর ফলে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ঢাকার হিন্দুরা পুজোর আনন্দে মেতে থাকলেও অন্যান্য এলাকার হিন্দুদের জন্য মনে ভয়েরও সঞ্চার হয়। জগজ্জনীর কাছে ঢাকার হিন্দুদের ঐকান্তিক প্রার্থনা— মা যেন আসুরিক শক্তির বিনাশ করেন। সকল অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে আমরা যেন শুভ শক্তির জাগরণ ঘটাতে পারি।

(লেখক ঢাকার বাসিন্দা, Pollux Technology Solution- এ কর্মরত)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দুর্গাপূজা

সুব্রত আচার্য

প্রতিবছরের মতো এবারও মা দশভুজা আসছেন। নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘ,কাশফুল, নদীর টলমলে জল, পাখিদের রব সবেতেই জানান দিচ্ছে— মা আসছেন। কুমোরপাড়ায় কর্মব্যস্ত সবাই। সবার মুখে এক কথা,'আর তো মাত্র কয়েকটা দিন। হাটে-বন্দরে, শহরে-দোকানে নতুন পোশাক প্রসাধনীর সমারোহ। নতুন নতুন সরঞ্জামে সাজছে

প্যান্ডেল। এ যেন এক আনন্দের জোয়ারে ভাসছে শহর থেকে গ্রাম।

২০২০ সালে সারা দেশে পুজোমণ্ডপের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ২১৩টি। ২০২১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩২ হাজার ১১৮টি। বছর বছর মণ্ডপসংখ্যা বাড়লেও বাড়ে না এদেশের হিন্দুদের সাহস। প্রাথমিক পরিসংখ্যান বলে এবছরও প্রায় ৩৫ হাজার পুজো হবে।

বিশিষ্টজনেরা এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, আগামী নির্বাচনও বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে এ বছরের পুজো একটু শঙ্কাজনক হবে। হিন্দু ভাইবোনদের আরও সতর্কও সাবধান হতে হবে। সরকার আরও একটু দায়িত্বশীল হলেই সুষ্ঠভাবে পূজা উদ্‌যাপন করা যাবে। গতবছর কুমিল্লার নানুয়াদীঘি -সহ সারাদেশে হত্যা, বাড়িঘর পোড়নো, মন্দিরে আগুন দেওয়া, প্রতিমা ভাঙচুর-সহ যে প্রকার তাণ্ডব চালানো হয়েছে, আজও তার বিচার হয়নি। দোষীরা শাস্তি পায়নি। এর পিছনে তাহলে কাদের হাত রয়েছে? এ দেশের হিন্দুরা কি নিকৃষ্ট প্রাণী?

গতবছর সরকারি তরফে ৩ কোটি টাকা আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়। যা ৩২ হাজার ১১৮টি পুজো কমিটিকে বন্টন করলে প্রত্যেকের ভাগে পড়ে ৯৩৪ টাকা করে। বাঙ্গালির বহন করে যে পুজো, সেই পুজোর উদ্যোক্তা-পিছু যদি বরাদ্দ হয় ৯৩৪ টাকা তা হলে হিন্দুদের পূজাপার্বণ নিয়ে সরকার কতটা সদর্থক চিন্তাভাবনা করে তা সহজেই অনুমেয়। সেই কারণেই মন্দির ভাঙচুর করা, মিথ্যে গুজব রটিয়ে মানুষ হত্যা, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ব্যক্তিরা আইনের হাতে ধরা পড়ার পরেও শাস্তি পায় না। সরকার যদি বিগত ঘটনার একটারও সঠিক ও নিরপেক্ষ বিচার করত তাহলে এই ধরনের ঘটনা আরও কমে যেত। অথচ অভিযুক্তরা কেউ মানসিক রোগী হিসেবে পার পেয়ে যায়, রাজনৈতিক নেতা হওয়ার সুবাদে কারও সাতখুন মাফ।

এতকিছুর পরেও এদেশের হিন্দুরা মনে দৃঢ় সাহস নিয়ে নতুন উদ্যমে মায়ের পূজার আয়োজন করে। ''তোরা ভাঙবি যত আমরা গড়ব তত'' এই কথা মাথায় রেখে নতুন করে নতুনদিনের আশায় ওরা পূজার আয়োজন করে। মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বলে, ''মাগো কবে মুছে দিবে ওই দাগ, কত করব আর তোমার পূজা ভগ্নরূপে, তোমার ওই দাগ মুছে, তোমার পূর্ণ প্রতিমায় কবে দেব অঞ্জলি।''

(লেখক বরিশালের বাসিন্দা)

মহাদেবীর আগমনের বার্তায় সেজে উঠেছে বাংলাদেশ

প্রান্ত সরকার

খড়কুটো দিয়ে প্রতিমা গড়ার সময় থেকে মূলত শুরু হয়ে যায় আমাদের দুর্গাপূজার আয়োজন। কুমোরপাড়ার চেয়ে বেশি আয়োজন চলে প্রতিটি পুজোমণ্ডপে। কারণ এখানে সরাসরি মন্দিরেই অধিকাংশ প্রতিমা তৈরি হয়ে থাকে। খড়কুটো থেকে বেণা বাঁধা দিয়ে শুরু করে একমাটি করা, দোমাটি করা, রং করা সবই যেন উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু। বাল-বৃদ্ধ সবাই দিনে একবার হলেও মন্দির প্রাঙ্গণে চক্কর কেটে যায়, প্রতিমা কতটুকু তৈরি হলো দেখার জন্য।

মহালয়ার শুভলগ্নে পিতৃতর্পণ এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গম্ভীর কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শুনতে শুনতে সূর্য ওঠে বাংলাদেশের আকাশেও। পরের দিন থেকে কোথাও শুরু হয়ে যায় প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পঞ্চমীতে বা ষষ্ঠীতে কল্পারম্ভ করা হয়। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় মায়ের বিল্বমূলের বোধন যেন মহাপ্রকৃতির বোধন। হালকা কুয়াশায় বোধন মন্ত্র উচ্চারণ এবং ঢাক সানাইয়ের বাদ্যে চারিদিকে মহামায়ার আমন্ত্রণ ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতি যেন গেয়ে ওঠে জাগরণ গীত। সপ্তমীর সকালে পুরোহিত বরণ, তারপর বিল্ববৃক্ষ থেকে দেবীকে ঘরে আনা হয়। সপ্তমীর পুজো শেষে অঞ্জলি, প্রার্থনা ও আরতি হয়। মহাষ্টমীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কুমারীপূজা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। মহানবমীও জাঁকজমকপূর্ণ ও ধর্মীয়ভাব গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করা হয়। দশমীতে মায়ের বিসর্জন, সিঁদুরখেলা ও গুরুজনদের প্রণাম করার মধ্য দিয়ে পুজো শেষ হয়। এবারের পুজোয় পূজামণ্ডপগুলিতে বাড়তি সতর্কতার কথা বলা হয়েছে, যাতে গতবারের মতো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

(লেখক খুলনার বাসিন্দা)

দুর্গাপূজা মানেই বাঙ্গালির অনন্য উৎসব

শেখর সেনগুপ্ত

আমাদের এখানে যখন প্রায় রাত্রিবেলা, তখন খবর এলো, ইউনেস্কো বাঙ্গালির দুর্গাপূজাকে বিশ্বের অন্যতম উৎসবরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। আনন্দে গৌরবে হৃদয়ে আমাদের জয়ঢাক বাজে। দুর্গাপূজা মানেই জাতির অনন্য উৎসব। জাতি বর্ণ, ভাষা, বয়স সবকিছুকে ছাপিয়ে হৃদয়ের আহ্লাদ জীবন্ত হয়ে ওঠে। মা দুর্গার এই প্রাণবন্ত পূজা প্রথম কবে শুরু হয়, জোর দিয়ে বলা কঠিন। চর্চা হয়েছে। দিনবদলের সঙ্গে এই নিয়ে বিভিন্ন মতের কাটাকুটিও বেড়েছে। বৈদিকযুগেও শক্তি আরাধনা ছিল। প্রমাণ, ঋকবেদের দেবীসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত। রামায়ণ ও মহাভারত— আমাদের এই দুই মহাকাব্যেই দেবীবন্দনার বিশদ বর্ণনা আমরা পাই। রামায়ণ জানায়, রাবণের শক্তিকে ধ্বংস করতে এবং তাঁকে হত্যা করবার শক্তিলাভ করতে রামচন্দ্র শরৎকালে দেবীদুর্গার অকালবোধন ঘটান প্রত্যাশা ও উদ্দীপনার সঙ্গে। আমরা জেনেছি, রাবণ ও মেঘনাদও দেবীর পূজা করতেন। কিন্তু দেবী তাঁদের ত্যাগ করে চলে যান রাম-লক্ষ্মণের দিকে। রাম ১০৮টি পদ্মের অর্ঘ্য দিতে পেরেছিলেন দেবীর শ্রীচরণে। প্রথমে পূজাপাত্রে এটি পখ কস পড়ায় শ্রীরাম নিজের একটি চক্ষু উৎপাটনে উদ্যত হলে দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন।

মহাভারতের বিরাটপর্বে আমরা এমন একটি দুর্গাস্তব লাভ করি, যা দুর্গাপূজার প্রাচীন স্তব থেকে আলাদা। কথিত আছে, রাম- লক্ষ্মণ-সীতাকে অপ্রতিহত শক্তি প্রদানের জন্য বেশ কয়েকজন ঋষি একত্রিত হয়ে ওই স্তব রচনা করে : পাঠ করেন এবং রাম-লক্ষ্মণও পুনরায় সেই স্তব উচ্চারণ করে দেবীর প্রসন্নতা অর্জন করেন। মা কখনও কোমল, কখনও কঠিন। মহাভারতের মহাকবিরা নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দেবীর আরাধনা করেছেন নানা ভাবে, নানাস্থানে এবং সেই সূত্রেই দেবীর পরিচিতি বিস্তারিত হয়েছে বিভিন্ন নামের মধ্য দিয়ে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— কালী, মহাকালী, চণ্ডী, মহিষাসুরমর্দিনী, ভদ্রকালী, কৃপালী, কুমারী প্রভৃতি। চণ্ডী অর্থাৎ দেবী দুর্গার

আবির্ভাবের নিশানা মেলে একটি পৌরাণিক কাহিনিতে। পুরাকালে দানব মহিষাসুর প্রবল পরাক্রমী হয়ে ওঠে। সে তাবৎ দেবতাদের নাস্তানাবুদ করে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল করায়ত্ত করে ফেলে। সবচেয়ে বেশি অপমানিত দেবকুলের অধিপতি ইন্দ্র। ইন্দ্রের নেতৃত্বে আলোচনায় বসলেন দেবতারা। সভায় মূল বক্তা ছিলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা বললেন, 'দেবতাদের মহিষাসুরের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র শ্রীবিষ্ণু অথবা দেবাদিদেব মহেশ্বর। আসুন, আমরা সকলে গিয়ে ওই দুই দেবনায়কের নিকট আমাদের দুর্দশা এবং মহিষাসুরের অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করি। শিব ও বিষ্ণু নিশ্চয় যথাযথ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করবেন।' অসুররাজের সঙ্গে দেবতাদের ওই নিত্য ঠোকাঠুকি ক্রমে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে শিব ও বিষ্ণু দুজনই ক্রোধে জ্বলতে থাকেন এবং সেই জ্বলন্ত শিখা থেকে যে মূর্তিময়ী দেবী আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনিই মা দুর্গা। দুর্গার প্রীত্যর্থে দেবগণ স্তব করা শুরু করে দিলেন। তাঁদের স্তুতি ও আহ্বানে সারা দিয়ে মা চললেন অসুরকে নিধন করতে।

দুর্গার ওই প্রতিমা এবং তাঁর পূজা কবে থেকে শুরু হলো, এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে চর্চা তথা গবেষণা চলে, তার কালপরিধি নেহাত ছোটো নয়। কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন মতামতের দৌড় চলেছিল। পরে অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত হলেন যে বাঙ্গলায় দুর্গাপূজা প্রথম আরম্ভ করেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। সেই পূজার অনুষ্ঠানে যে ব্যাপক সাড়া মেলে, দু-একজন ইতিহাসবিদ রসিয়ে রসিয়ে তার বর্ণনা দেবারও প্রয়াসী হন। মোদ্দা কথা, বাঙ্গালির দুর্গাপূজার বয়স হাজার বছর অতিক্রম করেছে। যত দিন যায়, এই পূজার সংখ্যা তত বাড়ে। বঙ্গবাসীর ক্ষুধিত চিত্তকে প্রশান্ত ও আনন্দমুখর করে তুলতে বারোয়ারি পূজার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আমাদের সকল স্বস্তি ও আনন্দ যেন দশভুজার দাক্ষিণ্য-নির্ভর।

দূর অতীতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতো মুখ্যত বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলে অবস্থাপন্ন ও প্রভাবশালী হিন্দু পরিবারগুলিতে। এই কারণেই ওই সকল ব্যক্তির প্রাসাদতুল্য নিবাসগুলির কাছে থাকতো একটি করে চণ্ডীমণ্ডপ। এইরকম একটি চণ্ডীমণ্ডপেই শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পাঠশালাটি খুলে বসেন। কোন কোন ধনী পরিবার মায়ের মূর্তি নির্মাণে কত অর্থ অকাতরে ব্যয় করতে পারেন, তার প্রতিযোগিতা ছিল অনিবার্য। দু'-একজন নিজের সর্বস্ব দেবার পরও কুড়িয়ে বাড়িয়ে অর্থ সংগ্রহ করে আনতেন বিবিধ উৎস থেকে। ঐতিহাসিক নথি ঘেঁটে ১৫৮০ সালে জানা যায় আকবর যখন দিল্লির মসনদে আসীন, মধ্য বাঙ্গলার রাজা কংস নারায়ণ সেই যুগে নয় লক্ষেরও বেশি টাকা ব্যয় করেছিলেন মা দুর্গার মূর্তি নির্মাণে। এই সময়ের হিসেবে টাকার অঙ্কে তা তিরিশ কোটিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। □

ভয়কে জয় করতে আমরা দুগ্গা দুগ্গা জপ করি

সুবল সরদার

বাঙ্গালির আবেগ, ভালোবাসা, পুনর্মিলন, নতুন করে ফিরে দেখার নাম দুর্গাপুজো। স্বর্গীয় কল্পনার এক জীবন্ত রূপদান দুর্গাপুজো। শিল্প, সাহিত্য, কাব্যেরও এক জীবন্ত রূপ বলা যায়। মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী, দেবী থেকে মানবীর অনন্যা রূপ থেকে পুজোর এই সৃষ্টি। যিনি দেবী তিনিই মানবী।

ছোটোদের কাছে পুজোর আগেই পুজো আসে। পুজো মানে শুধু ছুটি আর ছুটির মজা। পুজো মানে কাশবনে বাতাসের হিল্লোল। ঢাকের ঢ্যাং কড়াকুড় আওয়াজ। পুজোমণ্ডপে বাঁশের প্যান্ডেল। রঙিন কাপড়ের কারুকার্য। আল্পনার, কল্পনার রঙে রঙিন হয়ে রাঙিয়ে তোলে বাঙ্গালির মন।

আমার মনে আছে স্কুল ছুটির পর বিকেলে ছুটে যেতাম বিভাসদের বৈঠকখানায়। দেখতাম সেখানে অমূল্য পটুয়া ঠাকুর গড়ার কাজে কেমন মনোনিবেশ করে থাকত। কত রঙের পট! হাতে তার তুলি। সহপাঠী বিভাস এদিন কানে কানে বলল অমূল্য পটুয়া নাকি একদিন অন্ধ হয়ে যাবে। দেবীর চক্ষু দানের মাধ্যমে তার চোখ চলে যাবে শুনে আমার খুব মন খাবার হয়েছিল। শিল্পীদের এতো কষ্ট! মানুষকে আনন্দ দিতে হয় এতো ত্যাগের বিনিময়ে। শিল্পীর জীবন বলে কথা। এখন পুজো আসে কিন্তু তেমন আনন্দ পাই না। মনে আছে ষষ্ঠীর দিন ভোরবেলায় মা কাচা শাড়ি পরতেন। তিনি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আলপনা আঁকতেন।

মা দুর্গা হিমালয়ের কৈলাস ধাম থেকে আসেন এই মর্ত্যধামে। সঙ্গে থাকে তাঁর দুই ছেলে-মেয়ে— কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এক জমজমাট সুখী সংসার। তার আসা যাওয়ার যান হয় নৌকা, দোলা, ঘোড়া, কখনো-বা হাতি। তার প্রিয় বাহন সিংহ কিন্তু তার যান নয়। তিনি মঙ্গলময়ীরূপে মর্ত্যধামে শুধু আনন্দ দিতে আসেন। স্বর্গের দেবী ধরনীর পরে ধরা দেন কন্যা রূপে। তখন তিনি দেবী নন, কন্যা বলে আমরা ভাবতে শুরু করি। এইভাবে উমার আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে আকাশে বাতাসে। আগমনী গানে, তার আসার পদধ্বনি বেজে ওঠে মহালয়ার সুরে। আমি অবশ্য তার আগমন বার্তা পাই ঝরা শিউলি ফুলের বাতাসের গন্ধে। শরতের মৃদু ঠাণ্ডা বাতাসের শিহরণে ঠিক যেন মার হাতের কোমল মিষ্টি স্পর্শে। শরতের শিশির ভেজা ঘাসে। চির সবুজ বন বিতানের ঘ্রাণে। তিনিই নবপত্রিকা, কলা বউয়ের নব সংস্করণ হয়ে আসেন।

আমাদের গর্বের দুর্গাপুজো গত বছর ইউনেস্কো থেকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের গর্ব, আবেগ, ভালোবাসা, আমাদের শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে। এক বঙ্গ তনয়া অধ্যাপিকা তপতী গুহ ঠাকুরতার সফল প্রয়াস বলা যায়। এখন তার পথ যাত্রা শুধু কৈলাস থেকে মর্ত্যধামে নয়, বঙ্গপ্রদেশ থেকে সারা বিশ্বে সর্বজনীন রূপে। তাই পুজো এখন শুধু সর্বজনীন নয়, বিশ্বজনীন।

ভাবি মানুষ দেবতা গড়ে না দেবতা মানুষ সৃষ্টি করে? ভাবি যে দেবতা সুর সৃষ্টি করেন তিনি কেমন করে অসুর সৃষ্টি করেন যারা তাঁর প্রিয় সৃষ্টিকে ধ্বংস করে! যে দেবী নিরীহ ভেড়া সৃষ্টি করেন তিনি কেমন করে হিংস্র সিংহ সৃষ্টি করেন। ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, সুর-অসুর দুটোই তাঁর সৃষ্টি। লীলাময়ীর অনন্ত লীলার মধ্যে শরৎ আসে আনন্দের জোয়ারে ভেসে। তখন আনন্দে প্লাবিত হয় ধরণী। বাঙ্গালি সুখের জোয়ারে ভাসে।

তাঁর মল্লভূমি শুধু স্বর্গ নয়, নয় শুধু দানব মধুকৈটভে। শব্দ দৈত্যকে জব্দ করে দূষণমুক্ত পৃথিবী সৃষ্টি হোক তাঁর মাঙ্গলিক শক্তির মধ্যে দিয়ে। এই পৃথিবী হোক তাঁর মল্লভূমি যেখানে তিনি দানব মধুকৈটভেরূপী অত্যাচারীদের বিনাশ করতে পারেন। তিনি মহাশক্তির এক মহারূপ। সুন্দর ভয়ংকরী রূপ। তাই ভয়কে জয় করতে আমরা অভয় মন্ত্র জপ করি 'দুগ্গা দুগ্গা' বলে। ▯

পুজোর কেনাকাটা—সেকাল একাল

সুতপা বসাক ভড়

পুজো এলেই সবকিছু একটু অন্যরকম মনে হতে থাকে। ভাদ্রের পরে আশ্বিনের শারদ প্রাতের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ যেন নতুনের আগমন ঘোষণা করতে থাকে। এই শুভ উদ্‌ঘোষের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ এক বছরের অপেক্ষার নিরসন হয়। মা আসছেন। প্রকৃতিতে হয় নতুনের সূত্রপাত। সুদীর্ঘকাল ধরে প্রকৃতির এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসেছি আমরা। একদিকে কুমোরপাড়ায় মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ী রূপ নিতে আরম্ভ করে, অপরদিকে আমরা প্রস্তুত হই নতুনের ডালি সাজিয়ে। শারদীয়া দুর্গাপূজাতে এই নতুনের সূত্রপাত— কেনাকাটা, সেজে ওঠা— এই রীতি বহুকাল থেকে চলে আসতে।

আজ থেকে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগে ঠাকুমা-দিদিমার সময় শুনেছি— ভাদ্র মাস থেকেই বেশ গোছ করে কেনাকাটা শুরু হয়ে যেত। বাড়ি বাড়ি তাঁতিবউরা আসত ধুতি-শাড়ির পসরা নিয়ে। দুপুরে রান্না-খাওয়ার পরে বাড়ির মহিলাদের কাছে একটু সময় থাকত। ওই সময় তাঁতিবউরা এলে বেশ ধীরে-সুস্থে কাপড় নেওয়া হতো। তাদের কাছে থাকত নানা হাতের মাপের ধুতি, শাড়ি। বাড়ির ছোটো থেকে বড়ো পুরুষ সদস্যদের জন্য যথাযোগ্য ধুতি-শাড়ি। বাড়ির ছোটো মেয়ে থেকে বয়োজেষ্ঠ্যা মহিলা— সবার জন্য শাড়ি। ওইসব গাড়ির বৈচিত্র্যও যে খুব বেশি ছিল, তাও নয়। সাধারণত সবই সাদা-ঘোলের। ছোটো মেয়েদের শাড়িতে নানান রকম ডুরে ও পাড়ের তারতম্য থাকত। আর মধ্যবয়সিদের জন্য থাকত বিভিন্ন রকম নক্‌শা ও রঙিন পাড়ের শাড়ি। বয়স্কারা আরও হালকা-সরু পাড়ের শাড়ি নিতেন। ওই সময় বাড়ির সব মেয়ে-বউরা তাঁতিবউয়ের কাছে জড়ো হতে। বাড়ির কর্ত্রী সবার পছন্দমতো কাপড় নেবার চেষ্টা করতেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁতিবউকে নতুন নকশ্‌ার শাড়ি নিয়ে বেশ কয়েকবার আসতে হতো। গৃহদেবতা, সিংহাসনের অন্যান্য ঠাকুর, আত্মীয়স্বজনের পোশাকের সঙ্গে অনেক সিঁদুর-আলদা কেনা হতো। পরিচারক-পরিচারিকারাও নতুন বস্ত্র পেত। এমনকী, সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের ছোটো ছোটো বাচ্চাদের কথাও মাথায় রাখা হতো। তবে হ্যাঁ, অনেক মহিলা তখনও পর্যন্ত পায়ে চপ্পল জুতো পরতেন না। সেজন্য নতুন জুতোর প্রচলন তেমন ভাবে ছিল না। মূলত বাড়িঘর ভালোভাবে পরিষ্কার করে নতুন বস্ত্র কেনার প্রচলন ছিল

ফঃ ৩

সেকালের পুজোয়।

এরপর মা-কাকিমাদের সময় অর্থাৎ প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে চিত্রটা মূলত একরকম থাকলেও পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি। পুজোর সময় বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করা হতো, তবে অনেকসময় কেনাকাটা শুরু হতো চৈত্র সেল থেকে। প্রয়োজনীয় জিনিস ওই সময় একটু সুবিধার দামে কিনে রাখতেন মহিলারা। কেনাকাটার তালিকা লম্বা হতে শুরু হয়েছে। তাঁতিবউয়ের পরিবর্তে বাজারের দোকানে সাজানো শাড়ি তখন অনেক বেশি আকর্ষণীয়। চলচ্চিত্রের প্রভাবও কেনাকাটায় পড়ত। ছোটোদের পোশাকে অনেক বৈচিত্র্য এল, তবে হ্যাঁ, গৃহদেবতার নতুন কাপড়ের সঙ্গে এয়োস্ত্রীদের জন্য আলতা- সিঁদুর অবশ্যই নেওয়া হতো। পুজোর সময় বাড়িতে নতুন পর্দা, বিছানার চাদর নেওয়া হতো। সবার আবদার পুজোয় চাই নতুন জুতো। রেকর্ড, তারপর ক্যাসেটের মাধ্যমে পুজোর গানের সম্ভার আসত বাড়িতে। আরও কত কিছু! নতুন যুগের হাওয়া ছিল। তবে সব কেনাকাটার মধ্যে ছিল হিসেব। সতর্কতা। বাড়ির কাজের লোকেদের কথা অবশ্যই মনে রাখা হতো। অনেক সময় ব্যয় সংকোচন করার জন্য বাড়ির মহিলারা নিজেদের জন্য কেনাকাটার সাশ্রয় করার চেষ্টা করতেন। সব মিলিয়ে সবার জন্য কেনাকাটাই ছিল মূখ্য। সেখানে লোকদেখানো, খুব দামি পোশাকের প্রচলন তখনও বিশেষ চোখে পড়ত না।

বর্তমানে যে পুজোর কেনাকাটা দেখি সেখানে আছে প্রাচুর্য। কেনাকাটার তালিকায় কী নেই? তবে হ্যাঁ, আগে সবাই সারাবছর অপেক্ষার পরে পুজোর নতুন জামাকাপড় পেতেন। আর এখন— সারাবছর কেনাকাটা। বাজার দোকানের স্থান নিচ্ছে মল, অনলাইন শপিং। তবে উইন্ডো শপিং চলে সবসময়। মহিলাদের পোশাকের সীমাবদ্ধতা শাড়ির বাইরে— কখনও পুরুষদের মতো, কখনো ছোটো বাচ্চাদের মতো ছোটো পোশাক— সব কিনছে এবং পরছে। মানে পাল্লা দিয়ে রকমারি আসল-নকল গয়না, জুতো-চপ্পল, সাজের ভাণ্ডার, বাইক-গাড়ি, নতুন পোষ্য, এমনকী অনেকে নতুন বাড়িও কিনে ফেলেন। অত্যধিক প্রাচুর্যের মধ্যে অনেক সময় হৃদয়ের সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলি। বড়ো বেশি আত্মকেন্দ্রিকতা চোখে পড়ে। আনন্দ উপভোগ ও কেনাকাটার মধ্যেও প্রকট হয়ে ওঠে স্বার্থপরতা। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। নতুন প্রজন্মের অনেকে একক প্রচেষ্টায় সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের পাশে দাঁড়ায়, কেনাকাটার সম্ভার নিয়ে মিডিয়ার মাধ্যমে আবেদন জানায়— যে যেমন পারে নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা দেয়। আমরা সামাজিক প্রাণী। পুজো আমাদের সবার। সমাজের সকলের পাশে এইভাবে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য কেনাকাটা করে একটি নির্দিষ্ট দিনে পুজোর আগে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়ে থাকে। নতুন প্রজন্মের এই প্রচেষ্টা সাধুবাদযোগ্য। নিজেদের আনন্দ অনেকসময় কোনো আশ্রমের আবাসিকদের সঙ্গেও এইভাবে ভাগ করে নেয় তারা।

ওপর থেকে দেখলে এই প্রজন্মকে যতটা নির্মম, উচ্ছৃঙ্খল মনে হয়, সবাই ততটা নয়। পুজোর কেনাকাটায় তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। সেজন্য কেনাকাটার বাহ্যিক পরিবর্তন হলেও অন্তর্নিহিত ফল্গুধারা আজও বয়ে চলেছে। পুজো আমাদের সবার, সেজন্য পুজোর আনন্দ, কেনাকাটা আমরা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি আজও। মা আসছেন মা সবার; মা বিশ্বজনীন। তাই সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে হবে। □

পুজোর সময় হোমিওপ্যাথি সুরক্ষা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নির্বাচন সবসময়ই বিশেষজ্ঞের কাজ। এই চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগের লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। এক্ষেত্রে ভালো থাকার জন্য একটি গাইডলাইন দেওয়া হলো। তবে সমস্যা বেড়ে গেলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

সর্দি-কাশি-মাথাব্যথ্যা : পুজোর সময় মানে গরমের বিদায় এবং শীতের আগমনে। এই সময় সকালের দিকে গরম লাগে, আর রাত হলেই বাড়তে থাকে ঠাণ্ডা। আবহাওয়ার এরকম দোলাচলে ঠাণ্ডা লাগা খুবই সাধারণ একটা বিষয়। এমন অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগার যে কোনও রকমের সমস্যায় ডালকামারা-৩০ দিনে ৩ থেকে ৪ বার ৫ থেকে ৬টি বড়ি খেলে খুব ভালো কাজ দেয়।

এছাড়া অনেক সময় ঠাণ্ডা লেগে নাক থেকে জল পড়ার সমস্যা দেখা যায়। এক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট ন্যাপ-৩০ দিনে ৩ থেকে ৪ বার ৬ থেকে ৭টা বড়ি খেলে সমস্যা কমতে পারে।

যদি দেখা যায় মাথাটা ঠাণ্ডা লেগে ভার হয়ে গিয়েছে, গায়ে শীত শীত ভাব এবং গলাব্যথ্যা আছে, সেক্ষেত্রে হিপারসালফ-৩০ বা ২০০ মাত্রার ওষুধটি দিনে ৩ থেকে ৪ বার ৫ থেকে ৬টি বড়ি খেলে উপকার মেলে।

কারও ঠাণ্ডা খাবার বা পানীয় খাওয়ার জন্য গলা ব্যথা হয়েছে, কিছু খেলে মনে হচ্ছে যেন ইলেকট্রিক শক লাগছে, এমন লক্ষণে ফাইটোলাক্কা ২০০ দিনে ৩ থেকে ৪ বার খেয়ে নিলে ভালো। সঙ্গে ফাইটোলাক্কা মাদার টিংচার আধকাপ জলে ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা দিয়ে দিনে ২ থেকে ৩ বার গার্গেল করলে সমস্যা কমে যাবে।

জ্বর : সাধারণ জ্বর বা জ্বরের সঙ্গে গা-হাত-পায়ে ব্যথা থাকলে রাসটাকস-৩০ বা ২০০ খুব ভালো কাজ করে। ওষুধটি দিনে ৩ থেকে ৪ বার ৫ থেকে ৬টি বড়ি খেতে হবে, তবে জ্বর দু'দিনের বেশি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হবে।

পেট খারাপ, বদহজম, বমি, পায়খানা : বাইরের খাবার খেয়ে খুব বদহজম হয়েছে। জলতেষ্টা নেই, এমন উপসর্গে প্রতি ঘণ্টায় পালসেটিলা-২০০ ওষুধটির ৫ থেকে ৬টি বড়ি খেলে সমস্যা কমতে পারে। আর একই সমস্যা বাড়ির খাবার খেয়ে হলে নাস্কভমিক-৩০ বা ২০০ খুবই উপকারী। অনেক সময় পাতলা পায়খানা খুব বেশি হলে ধরে রাখার সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে অ্যালো ওষুধটি দিনে ৩ থেকে ৪ বার ৫ থেকে ৬টি বড়ি খেতে হবে।

খুব গা বমিভাব থাকলে একই ডোজে ইপিকাক ওষুধটি খেলে ভালো। ফুড পয়জেনিং-এর মতো অনবরত বমি এবং পায়খানা হতে থাকলে আর্সেনিক-২০০ ওষুধটির ৫ থেকে ৬টি বড়ি খেলে সমস্যা কমতে পারে। আর একই সমস্যা বাড়ির খাবার খেয়ে হলে নাক্সভমিক-৩০ বা ২০০ খুবই উপকারী। অনেক সময় পাতলা পায়খানা খুব বেশি হলে ধরে রাখার সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে অ্যালো ওষুধটি দিনে ৩ থেকে ৪ বার ৫ থেকে ৬টি বড়ি খেতে হবে।

খুব গা বমিভাব থাকলে একই ডোজে ইপিকাক ওষুধটি খেলে ভালো। ফুড পয়জেনিং-এর মতো অনবরত বমি এবং পায়খানা হতে থাকলে আর্সেনিক-২০০ ওষুধটি দিনে ৪ থেকে ৫ বার ৬টি বড়ি ফসফরাস-২০০ ভালো কাজ দেয়।

শ্বাসকষ্ট : শ্বাসকষ্টের সমস্যার জন্য রাতে জেগে থাকতে হলে আর্সেনিক ওষুধটি দিনে ৩ থেকে ৪ বার ৫ থেকে ৬টি বড়ি করে খেতে হবে। শ্বাসকষ্টের জন্য বুকে সাঁই সাঁই আওয়াজ হলে স্পঞ্জিয়া ওষুধটি একই ডোজে খেলে উপকার পাবেন।

ব্যথা : পুজোয় নতুন জুতো পরে হাঁটার জন্য পায়ের ফোসকায় জেরবার অনেককেই হতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যথা নিবারণে আর্নিকা-২০০ দিনে ৩ থেকে ৪ বার খেতে হবে। তবে শুধু ফোসকার ব্যথা নয়, যে কোনও ব্যথার ক্ষেত্রেই একই ডোজে আর্নিকা খেলে খুব ভালো কাজ করে। ▯

দিল্লির বাঙ্গালিদের চোখে দুর্গাপূজা

পিয়াসা গোস্বামী

পিতৃপক্ষের শেষে মাতৃপক্ষের আবাহনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মেঘমন্দ্র স্বরেই বাঙ্গালির সার্বজনীন বিশ্বজননীর বন্দনা দুর্গাপুজোর আবহাওয়া ঘিরে ধরে বাঙ্গালি মনকে। বারো মাসে তেরো পার্বণে বাঙ্গালি যখন বাঙ্গলার বাইরে আসে তখন বলে, দুই বাঙ্গালি এক হলে ক্লাব খোলে, তিন বাঙ্গালি দুর্গাপূজা শুরু করে, আর চার বাঙ্গালি এক হলে কালী বাড়ি তৈরি হয়। নতুন পুরানো মিলিয়ে দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় সাড়ে ছশো দুর্গাপূজা হয়। আত্মবিস্মৃত বৃত্তের বাইরে বাঙ্গালি এই কটাদিন নিজের উপস্থিতি জানান দেবার জন্য ডালপালা মেলে।

ষষ্ঠীর দিনে দেবীর বোধন হলেও আজকাল মহালয়া থেকেই পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজোর সূত্রপাত হয়ে থাকে। তবে দিল্লির পূজা শুরু হয় পঞ্চমীতে। তবে পঞ্চমীর দিনটা তোলা থাকে আনন্দমেলার জন্যে। বিভিন্ন পুজো সমিতির সদস্যরা নিজের রান্নাবান্না করে স্টল দেন এবং সদস্য-অসদস্য নির্বিশেষে টোকেন দাম দিয়ে খেয়েদেয়ে রসনা পূর্তি করেন। তখন বাঙ্গালির ঘরে হেঁসেল চলে না। উৎসবের পাঁচটা দিন নিজ নিজ দুর্গাপুজো এবং তৎসংলগ্ন খাবার স্টলগুলোতেই দিন গুজরান হয়। আর একটি বিষয় চোখে পড়ে দিল্লিতে তা হলো দিল্লির পুজো মণ্ডপগুলোর পরিবেশ দূষণ রোধকারী তৎপরতা। এক্ষেত্রে দিল্লি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন কিছুটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। ষষ্ঠী থেকে দশমী সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় সি আর পার্ক। যেভাবে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ হয়ে যায়, পুজোর কটা দিন চিত্তরঞ্জন পার্কে বসবাসকারীদের জন্য গাড়ির স্টিকার ইস্যু করা হয়। কলকাতার অ্যাপার্টমেন্টের পুজোগুলির সঙ্গে দিল্লির অধিকাংশ পুজোর চরিত্রগত মিল আছে। সকালে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন--- সংস্কৃতিমনস্ক পূজা সমিতিগুলোতে থাকে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘরোয়া ও বহিরাগত শিল্পীদের সমন্বয়ে।

এখানে বিসর্জনের নিয়মটা বেশ অন্যরকম। বেশিরভাগ পূজা কমিটি জমায়েত হন। যমুনার এক নাতিগভীর অঞ্চলে বিসর্জন দেওয়া হয় লাইন দিয়ে। সুন্দর ব্যবস্থা। ক্রেনের মাধ্যমে কাঠামো তুলে নেওয়া হয়, সঙ্গে চাঁদমালা এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী। বাকিরা অস্থায়ী পুকুর খুঁড়ে বিসর্জন দিয়ে পরিবেশে নিজের অঙ্গীকারটুকু রাখেন। তারপর বিজয়ার প্রণাম, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। কলকাতার পুজোগুলো এখন থিমের কৃত্রিমতায় ভরা। সেখানে পুজোর প্রকৃত প্রাণটা প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। দুর্গাপূজা বাঙ্গালির প্রাণ-মনের উৎসব। প্রাণ মন ছাড়া বৈভবের উৎসব হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। প্রবাসী বাঙ্গালিদের প্রচেষ্টায় দিল্লির পুজোগুলোর মধ্যে এখনও সেই প্রাণ ও মনের উৎসবের হদিশ মেলে।

(লেখক দিল্লির বাঙ্গালি গৃহবধূ)

পুজোর কথায় এখনও বাঙ্গালির বুকে শিউলি ফোটে

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

যারা বলেন আগে সব ভালো ছিল আর এখন যা হচ্ছে সবই খারাপ— এই নিবন্ধ লেখক তাদের দলে পড়েন না। আগেও সব ভালো ছিল না, এখনও সব খারাপ হচ্ছে না। আসলে প্রত্যেক প্রজন্মের কাছে তার নিজের সময়টি শ্রেষ্ঠ সময়। আগে কী হয়েছে বা পরে যা হচ্ছে, তার সবই তারা নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন এবং যে-যার নিজস্ব ধ্যানধারণা অনুযায়ী একটা লেবেল সেঁটে দেন। একথা বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ পার্বণ দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রেও খাটে। যেসব বাঙ্গালির বয়েস পঞ্চাশ বা তার বেশি, তাঁরা গত তিন দশক ধরে একটি প্রশ্ন নিয়ে নাজেহাল। কোন পুজো শ্রেষ্ঠ— থিমের পুজো নাকি ঐতিহ্যবাহী পুজো?

বলাবাহুল্য, বহু ব্যবহারে প্রশ্নটা ক্লিশে হয়ে গেছে। অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন এবং দিয়েওছেন। থিমের পুজো শুধুমাত্র আধুনিক বলে বা বিপণনের ভাবনায় আক্রান্ত বলে আজকের দিনে তাকে বাতিল করা যাবে না। কোনও কিছুর প্রতি সাধারণ মানুষের আবেগ যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয় তাহলে তা যাই হোক, তাকে ঘিরে রাজনীতি ও বাণিজ্য হবেই। আবার এই প্রবণতাকে খুব আধুনিকও বলা যাবে না। আমাদের দেশে অসংখ্য মঠ-মন্দির আছে। এইসব মঠ-মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণের তিরুপতি, মীনাক্ষী ও পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির, পশ্চিম ভারতে সোমনাথ মন্দির এবং উত্তরে কাশীবিশ্বনাথ মন্দিরের সম্পদ চোখে পড়ার মতো। এই সম্পদ নিশ্চয়ই রাজা ও বণিকদের দান ব্যতিরেকে অর্জিত হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজা ও বণিকেরাই ছিলেন মন্দিরগুলির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এখন সেই জায়গায় এসেছেন রাজনৈতিক নেতা ও কর্পোরেট সংস্থাগুলি। বেশি পিছনে যেতে হবে না। দুই দশক আগেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে মেলা বসত। গ্রামের সাধারণ মানুষ মণ্ডপে গিয়ে পুজোয় যেমন অংশ নিতেন, ঠিক তেমনি বাড়ি ফেরার সময় মেলা থেকে সংসারের প্রয়োজনে লাগে এরকম নানা জিনিসপত্রও কিনতেন। যুক্তিসঙ্গত ভাবে বিচার করলে বলতে হয় গ্রামের এই মেলাও দুর্গাপুজোর বাণিজ্যকরণের একটা অংশ। কিন্তু আসলে তা তো নয়। মণ্ডপের ভেতরে যারা অষ্টমীর সকালে অঞ্জলি দিতেন আর মেলায় ছোট্ট দোকানঘরটিতে বসে যারা কাচের চুড়ি বিক্রি করতেন— কারোর মনেই মা দুর্গার প্রতি ভক্তি-ভালোবাসায় খামতি

ছিল না। সুতরাং আজ যে-সব রাজনৈতিক নেতা বা কর্পোরেট সংস্থার কর্তা দুর্গাপুজোর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তাদের মনেও মা দুর্গার প্রতি সেই শ্রদ্ধা আছে কিনা, সেটাই সব থেকে জরুরি প্রশ্ন। যদি থাকে তাহলে থিমের পুজো আপত্তির কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

অনেকে মনে করেন দুর্গাপুজোয় 'থিম' ব্যাপারটা একেবারে আলটপকা এসে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বলাবাহুল্য, যারা এরকম বলেন তারা খুব একটা ইতিহাস-সচেতন নন। এ ব্যাপারে বর্তমান নিবন্ধ লেখকের অভিজ্ঞতা একেবারেই বিপরীত। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। সঠিক সালটা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে ১৯৯২-র পরেই হবে। হাওড়া শহরের জাতীয় সেবাদল নামের একটি ক্লাব অযোধ্যার নির্মীয়মান;ণ রামমন্দিরের আদলে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ নির্মাণ করিয়েছিল। সেবার শুধু সেই মণ্ডপ দেখার ইচ্ছায় কত যে মানুষ জাতীয় সেবাদলের পূজাপ্রাঙ্গণে এসেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। চতুর্থীর দিন থেকে শুরু করে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত মানুষের ভিড়ে এতটুকু ছেদ পড়েনি। বাড়তি পাওনা ছিল মণ্ডপের ছবি। প্রতি ছবি দু'টাক দামে বিক্রি করেছিলেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। কত হাজার ছবি যে বিক্রি হয়েছিল তারও কোনও হিসেব নেই। রামমন্দির নিয়ে সারা দেশে তখন মারাত্মক আবেগ। সেই আবেগ বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করেছিল ক্লাবটি। বস্তুত, সেই সময় হাওড়ার বেশ কয়েকটি বড়ো বড়ো ক্লাব ভারতের নানা বিখ্যাত মন্দিরের আদলে তাদের দুর্গাপুজো বা কালীপুজোর মণ্ডপ নির্মাণ করাত। এমনকী, মহেঞ্জোদাড়োর স্নানাগারের আদলে নির্মিত মণ্ডপ দেখার সৌভাগ্যও এই নিবন্ধ লেখকের হয়েছে। শুধু হাওড়া নয়, কলকাতারও অনেক ক্লাব এই ধরনের মণ্ডপ তৈরি করাত। এইসব ক্লাব আক্ষরিক অর্থেই বড়ো ক্লাব। এদের সভ্যদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী থাকতেন। পুজোর সময় তারা মোটা অঙ্কের চাঁদা দিতেন। এছাড়া ছিল মোটা টাকার স্পনসরশিপ। মণ্ডপে ঢোকার আগেই চোখে পড়ত বড়ো বড়ো হোর্ডিং। সেখানে বোরোলিন, পি.সি. চন্দ্র থেকে শুরু করে বাঙ্গালি শিল্পপতিদের অনেকেই থাকতেন। থাকতেন তার কারণ পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজোর একটা সার্বজনীন চেহারা আছে। এখানে মানুষ বাড়িতে বসে বা মন্দিরের ভেতরে দুর্গাপুজো করে না। তারা ঠাকুর দেখার জন্য বাইরে বেরোয়। সুতরাং পুজোর পাঁচদিনে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাটে যে বিপুল জনসমাগম হয় তাকে কোনও বাণিজ্যগোষ্ঠীই উপেক্ষা করতে পারে না। শুধু বাণিজ্যগোষ্ঠী-বা কেন, যাদেরই রুটিরুজি জনসংযোগের ওপর নির্ভরশীল— সে রাজনৈতিক নেতাই হোন বা ব্যবসায়ী— তাঁরা কেউই জনসংযোগের এই বিশাল সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পুরোপুরি থিমের পুজো না হলেও থিমের পূর্বাভাস নব্বইয়ের দশকেই এসে গিয়েছিল। তখন সমসাময়িক কোনও ঘটনা বা বিখ্যাত কোনও মন্দিরের স্থাপত্যরীতিকে মণ্ডপসজ্জায় ফুটিয়ে তুলতেন ক্লাবকর্তারা। এবং এই নবনির্মাণে অংশগ্রহণ করত বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা। এ ব্যাপারে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নব্বইয়ের দশকেই সেরা মণ্ডপ, সেরা প্রতিমা ও সেরা আলোক সজ্জাকে পুরস্কৃত করার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। উদ্যোগ নিয়েছিল বিখ্যাত রং-নির্মাতা এশিয়ান পেইন্টস। নব্বইয়ের দশকে যাঁরা বড়ো হয়েছেন তাঁরা সকলেই এশিয়ান পেইন্টস শারদ সম্মানের কথা শুনে থাকবেন। এছাড়া ছিল বাটা। 'পুজোয় চাই নতুন জুতো' ছিল বাটার বিখ্যাত ট্যাগলাইন। এইচএমভির শারদাঞ্জলি ছিল এরকম আরেকটি বিখ্যাত ট্যাগলাইন।

একথা ঠিক যে ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোর সহজ-সরল রূপটি নব্বইয়ের দশকের বাজার অর্থনীতির পরিসরে আপাত জটিল এক পাঁচমেশালি চেহারায় বদলে গিয়েছিল। এই বদলকে দুর্গাপুজোর বাণিজ্যকরণ বললেও ভুল কিছু বলা হবে না। কিন্তু এই বদলের শেকড়ে পৌঁছতে হলে আমাদের যেতে হবে আরও পিছনে, পঞ্চাশের দশকে। অশোক গুপ্ত ছিলেন সেই শিল্পী যিনি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপ্রতিমার চেহারা বদলে দিয়েছিলেন। ধনী পরিবারের সন্তান অশোকের ঠাঁই হয়নি বাড়িতে। কারণ প্রতিমার গঠন সম্বন্ধে তাঁর মতে সায় দেননি বাড়ির লোকেরা। ১৯৫৬ সালে উত্তর কলকাতার জগৎ মুখার্জি পার্কের পুজোয় অশোক গুপ্ত এক ভিন্ন ধরনের প্রতিমা নির্মাণ করলেন। কলকাতায় এক নতুন শব্দবন্ধ তৈরি হলো— আর্টের ঠাকুর। তারপর ১৯৭৫ সাল। বিখ্যাত শিল্পী নীরদ মজুমদার দক্ষিণ কলকাতার বকুলবাগানের প্রতিমা নির্মাণ করলেন। তারপর থেকে কে কত বড়ো শিল্পীকে দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করাতে পারে আর কত বড়ো মণ্ডপশিল্পীকে দিয়ে মণ্ডপ নির্মাণ করাতে পারে তার প্রতিযোগিতা লেগে গেল। যদিও তখনও দুর্গাপুজোর মণ্ডপ এখনকার মতো শিল্পীর ক্যানভাস হয়ে ওঠেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ভারতের কোনও-না-কোনও মন্দিরের স্থাপত্যরীতির আদলে তৈরি মণ্ডপই দেখতাম। এখনকার মণ্ডপে যেমন মাঝে মাঝে বিমূর্ত ভাবনার আভাস চোখে পড়ে তখন তা ছিল না। গত দুই দশকে পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে। প্রায় প্রতিটি পূজাকমিটি আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা শিল্পী ও ভাস্করদের দিয়ে প্রতিমা ও মণ্ডপ নির্মাণ করাচ্ছে। প্রতিমা ও মণ্ডপ হয়ে উঠেছে পরীক্ষানিরীক্ষার ল্যাবরেটরি। কোথাও দেখা যাচ্ছে দুর্গা অস্ত্রহীন। কোথাও আবার দুর্গা চতুর্ভুজা বা দ্বিভুজা। কোথাও মহিষাসুরহীন। কোথাও দুর্গা নাগরিক রূপ ত্যাগ করে রীতিমতো জংলি। দেখলে ভয় করে। মণ্ডপসজ্জাতেও নতুনত্ব এসেছে। মাটির ভাঁড় দিয়ে তৈরি মণ্ডপ কলকাতায় দেখা গেছে। আবার জুতো দিয়ে মণ্ডপসজ্জাও আমরা দেখেছি। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে ক্লাবকর্তারা একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার নেশায় টালমাটাল। তাদের শুধু একশো শতাংশ হিট থিম চাই। টাকার অভাব নেই। থিম যতই দামি হোক তারা তা নামিয়ে দেবেন। তাতে যদি দুর্গাপুজোর চিরন্তন মাধুর্য সরে যায় তো ক্ষতি নেই। এখানেই রয়ে গেছে থিমের পুজোর বিপদ। ইঁদুর দৌড়ের ইঁদুরেরা যেমন মূল্যবোধের পরোয়া করে না— যে ভাবে হোক আগে দৌড় শেষ করে দড়িতে ঝোলানো লজেন্স মুখে পোরাতেই তাদের সিদ্ধি— ঠিক তেমনই একলযেঁড়ে স্বভাবের এই ক্লাবকর্তারাও। তাদের কোনও মূল্যবোধ নেই, সমাজবোধ নেই--- সম্ভবত শেকড়ও নেই। তারা শুধু প্রতিযোগিতায় জিততে চান। দুর্গাপুজোর প্রতি বাঙ্গালির আবেগকে ব্যবহার করে অর্থ আর ক্ষমতার সিংহাসনে বসে থাকতে চান।

আগেই বলেছি, থিমের পুজোয় যদি নিষ্ঠার অভাব না থাকে তাহলে আপত্তি করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন হলো সত্যিই নিষ্ঠা আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালিকেই খুঁজতে হবে। যদি উত্তরটা নেতিবাচক হয় তাহলে থিমের পুজোর দরকার নেই। আমরা আবার সেই আদি ও অকৃত্রিম একচালার ঠাকুরের কাছে ফিরে যাব। জৌলুসহীন প্যান্ডেলে কাঁচা মাটির ওপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে অষ্টমীর অঞ্জলি দেব। পায়ের নীচে কার্পেট নেই বলে আমাদের রাগ হবে না। অনেক কিছু না-থাকার মধ্যেও একটা জিনিস থাকবে। সেটা সেই আবেগ। যে আবেগে আজও বিজয়া দশমীর দিন বাঙ্গালির চোখের পাতা ভিজে যায়। বাড়ির চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালি বলে, আসছে বছর আবার আসিস, মা। ■

মায়ানগরী মুম্বাইয়ের শারদীয়া দুর্গাপূজা

সঞ্জীব দে

প্রচলিত প্রবাদবাক্য অনুযায়ী বাঙ্গালির বারোমাসে তেরো পার্বণ হলেও শারদীয়া দুর্গাপুজো আজও বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব। দুর্গাপুজো সমগ্র হিন্দু সমাজে প্রচলিত থাকলেও যুগ যুগ ধরে দুর্গাপুজোর সঙ্গে মিশে আছে বাঙ্গালির আবেগ, ভালোবাসা ও চোখের জল। পুজোর কটাদিন ভোজন রসিক, ফুর্তিবাজ বাঙ্গালির গান-বাজনা, ভুড়িভোজ ও হইহুল্লোড়ের কথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না। বর্তমান সময়ে দুর্গাপূজা পালিত হয় ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল-সহ বিশ্বের একাধিক দেশে। জনপ্রিয়তায় কলকাতার দুর্গাপূজা অবশ্যই অন্যতম। এরপরেই আসে মুম্বাইয়ের পূজার স্থান। বাঙ্গলার থিমের আমেজ আজ পৌঁছে গেছে আরব সাগরের তীরে মায়ানগরী মুম্বাইয়ের মণ্ডপেও। খাওয়াদাওয়া, সন্ধ্যায় ঢাকের তালে ধুনুচি নাচ, শেষে সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে আজ গর্বের সঙ্গে নিজেকে আমরা 'ষোলো আনা বাঙ্গালি' বলেই মনে করি! মুম্বাইয়ে ২৫ থেকে ৩০টি দুর্গাপূজা হয়। মুম্বাইয়ে প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ১৯৩০ সালে স্থাপিত বম্বে দুর্গাবাড়ি সমিতির পুজো, তেজপাল হল, আগস্ট ময়দান, গ্রান্ডরোড মুম্বাই। ১৯৩৫ সালে স্থাপিত বেঙ্গল ক্লাব সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, শিবাজী পার্ক, দাদার। এই পুজো দুটি ধীরে ধীরে শতবর্ষের পথে। শিবাজী পার্কে কালীমন্দিরের গা ঘেঁষে নির্মাণ হয় পুজো মণ্ডপ। দর্শনার্থীরা কালীমাকে প্রণাম করেই মণ্ডপে প্রবেশ করে। চেম্বুর দুর্গাপূজা অ্যাসোসিয়েশনের পুজোটি এবার ৬৮ বছরে পা দিতে চলেছে। শক্তি সামন্তের পুজো বলে খ্যাত বান্দ্রার নতুন পল্লির পুজোটির এবছর ৪২ বছর পূর্ণ হবে।

বর্তমানে বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্য অভিনেতা লাকী মুখার্জি এই পুজোটির সভাপতি। গায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্যের লোখন্ডওয়ালা দুর্গা পুজোর বয়স ২৭ বছর। পুজোটি যথেষ্ট মন কেড়েছে দর্শনার্থীদের। দুপুরে ভোগ প্রসাদ, সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন ঢাকির ঢাকের তালে মন মাতানো ধুনুচি নাচ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গে এবার ২৭ বছরে পা দেবে উদয়ন পুজো কমিটির দুর্গাপুজো, স্থান— জুরিমুরি, সাকিনাকা মুম্বাই। মুম্বাইয়ে যে পুজোয় কাজল, রানি মুখার্জি-সহ একাধিক বলিউডের তারকার আনাগোনা হয়, সেই পুজোটি হলো মুখার্জি পরিবারের 'নর্থ বম্বে সার্বজনীন দুর্গাপুজো। পাঁচতারা হোটেল টিউলিপ স্টারে পুজোর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে থিমের টানে নজর কেড়েছে পাওয়াই সার্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটির পুজোটি।

এছাড়াও অনেক পুজোর মধ্যে আছে আন্ধেরি ওয়েস্টে 'প্রগতি শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা কমিটি'। এই পুজোটি ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এবার ডায়মন্ড জুবলি উদ্‌যাপন করবে। এই পুজোটিতে বেশ কয়েকবার ভোগ প্রসাদ নিতে গিয়েছিলাম। মুম্বাইয়ের কান্দেবলির ঠাকুর ভিলেজের পুজোটি যথেষ্ট জনপ্রিয়। কান্দেবলি সংস্কৃতি দুর্গাপুজো কমিটির

পুজো-সহ আরও কয়েকটা পুজো হয় সেখানে। সবশেষে গোরেগাঁও কল্লোল কালী পুজো কমিটির দুর্গাপুজো এবং খার রোডে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ তাদের ভক্তবৃন্দের সঙ্গে আড়ম্বড়ের সঙ্গে শারদীয়া দুর্গাপূজা পালন করে মহা অষ্টমীতিথিতে কুমারী পুজোর মাধ্যমে। যে পুজোর কথা না বললে মুম্বাইতে আমার ঠাকুর পরিক্রমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সে পুজোটি আমার পাড়ার পুজো— ২০০২ সালে শুরু হয় মহাকালী সার্বজনীন দুর্গোৎসব, পুনম নগর, আন্ধেরি ইস্ট। যদিও পাড়ার পুজোটি দেখতে প্রায় এক কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যেতে হয়।

বলে রাখা ভালো যে, মুম্বাইয়ে এক পুজো মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপের দূরত্ব দুই কিলোমিটার থেকে চার কিলোমিটারেরও বেশি হতে পারে। পাড়ার পুজোর শুরুর বছরের খানিকটা স্মৃতি আজও মনে আছে। সেবার গোটা কয়েক পুজো দেখতেই রাত কেটে গেল। প্রথমবার সপরিবারে শেষরাতে পাড়ার পুজো দেখতে পৌঁছলাম। চারিপাশ অন্ধকার দর্শকহীন পূজা প্রাঙ্গণ। মণ্ডপে একটি মাত্র সিকিউরিটি গার্ড চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছে। ছোটো একটি সাধারণ মণ্ডপে ছোটো সুন্দর দেবী প্রতিমা। প্রতিমার পেছনে হাতে আঁকা সিনারি, তবে তাতে শিবের মূর্তি নেই, বোঝা গেল পুজো কমিটি তরিঘড়ি একটি শিব ঠাকুরের ক্যালেন্ডার কেটে সিনারির মাথায় লাগিয়ে দিয়েছে। আমি প্রথম অবস্থায় দেখেই বললাম, 'শিবের ছবিটি বাঁকা করে লাগানো হয়েছে। এর কিছুদিন পর পুজো কমিটির এক সদস্যের সঙ্গে পথে দেখা, একথা সেকথার পর বললাম, 'মলয়দা, রাতে পুজোমণ্ডপ বেশ অন্ধকার ছিল, আর শিবের ফটোটা সোজা বসেনি। মলয়দা আমতা আমতা করে শেষে একমুখ হাসি হেসে প্রসঙ্গে ইতি টেনেছিলেন। আজ সে পুজোয় হাজারো মানুষের ভিড় হয়। দুপুরে ভোগ, সন্ধ্যায় আরতি সেরে বসে সন্ধ্যার জলসা।

মুম্বাইয়ের প্রায় সব পুজো প্রাঙ্গণের মেলার মতোই পুনম নগরের পুজোও মেলার সাজে সেজে ওঠে। নাগরদোলা, খাবারের স্টলের সঙ্গে তাঁতের শাড়ি, শাঁখা-সিঁদুর, কাসুন্দি, ডালের বড়ি, পাটালি গুড়ের মতো বাঙ্গলার নানান সামগ্রী নিয়ে স্টল বসে পুজোর কটাদিন। বাঙ্গালির এই প্রিয় জিনিসগুলো মুম্বাইয়ে সহজে পাওয়া যায় না। এরপর বাড়ি ফেরা। শুনশান রাস্তা, ফকফকে স্ট্রিট লাইটে কয়েকজন পথচারী, বন্ধ দোকান-পসার ছাড়িয়ে এলাকার আবছা পথ ধরে কাকভোরে নিঃশব্দে বাড়ি ফেরা। প্রথম প্রথম মুম্বাইয়ে পুজো দেখতে গিয়ে আমি যেন হারিয়ে যেতাম। ঢাকের বাজনা, চরণামৃত, আর রোল, মোগলাই, কষা মাংসের সুগন্ধের সঙ্গে হইহুল্লোড়ের সব ভাষাই তখন নিজের মাতৃভাষা হয়ে কানে বাজতো। যখন ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত পুরুষদের মাঝে শাঁখা, সিঁদুরে সজ্জিত মহিলাদের দেখতে পেতাম, তখন সেই ভিড় ছেড়ে আসতে মন চাইতো না কিছুতেই। ওই সময়টুকু যেন আবারও ফিরে পেতাম নিজেকে। তা নস্টালজিয়া বা নস্টালজিক বা আবেগপ্রবণ বাঙ্গালি যাই বলুন না কেন, আমি তখন তার সবটাই।

(লেখক আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বাইয়ের বাসিন্দা)

বাঙ্গলাজুড়ে হরেক

কোথাও মা দুর্গার কালো বরণ। কোথাও উমা হলেন চতুর্ভুজা। প্রাচীন রীতি মেনে আজও গ্রামবাঙ্গলায় অন্যধরনের পুজোর প্রচলন আছে। তারই কয়েকটা তুলে ধরা হলো প্রচ্ছদ নিবন্ধে।

ছোটো হাতের দুর্গার আরাধনা হয় কীর্ণাহারের সরকার বাড়িতে

যত কাণ্ড বীরভূমের কীর্ণাহারের সরকার বাড়িতে। মা দুর্গা এখানে দশভুজা হলেও হাতগুলি সাধারণ মাপের তুলনায় ছোটো! মায়ের বাহন সিংহের পরিবর্তে সেখানে দণ্ডায়মান নরসিংহ। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ থাকলেও সেখানে জায়গা পায় না তাদের বাহনগুলি। একমাত্র দেখা যায় কার্তিকের বাহন ময়ূরকে। বাঙ্গলার বাকি পুজোগুলোর থেকে অনেকটাই আলাদা বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের সরকার বাড়ির পুজো। সরকার বাড়ির এই পুজো এবার ৩৫১ বছরে পড়ল। এখানকার অষ্টধাতুর দুর্গা প্রতিমা হলেন সাক্ষাৎ মা চামুণ্ডা। তাই মায়ের দুটি হাত এখানে স্বাভাবিক মাপের হয়। বাকি আটটি হাত হয় ছোটো মাপের। সরকার বংশের পূর্বপুরুষ কিশোর কুমার সরকারের হাত ধরে এই পুজোর প্রচলন হয়। একচালা কাঠামোয় মা এখানে বিরাজ করেন চার ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। এখনও এখানে তালপাতার পুঁথি দেখে পুজো, হোম অনুষ্ঠিত হয়। কীর্ণাহারের সরকারদের এগারোতম বংশধর রাজা সরকার। তিনি জানান, মহালয়ার পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদের দিন থেকেই ঘট পুজোর মধ্য দিয়েই শুরু হয়ে যায় দুর্গাপুজো। সপ্তমীর দিন থেকে শুরু হয় যজ্ঞানুষ্ঠান। এ হলো সরকার বাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই হোমের আগুন জ্বলতে থাকে একবারে দশমী অবধি। হোমের আগুন জাগিয়ে রেখেই হোমযজ্ঞ চলে প্রতিদিন।

স্বপ্নাদেশে গণেশ-কার্তিকের স্থান বদল হয় বালুরঘাটের সাহা পরিবারে

দেবী দুর্গার ডানদিকে থাকেন গণেশ, বাঁদিকে কার্তিক। সেভাবেই ফিবছর পুজো হচ্ছিল বালুরঘাটের সাহা পরিবারে। একবছর পুজোয় ঘটল অবাক কাণ্ড। সাহাদের দুর্গামণ্ডপে একচালা প্রতিমার সাজসজ্জা সম্পূর্ণ। ভোরে দেখা গেল গণেশ-কার্তিক দিব্যি তাঁদের জায়গা বদল করে ফেলেছেন! সবার চোখের সামনে সেই একচালা প্রতিমা গড়েছেন শিল্পী। অথচ এখন উলটপুরাণ! সাহাবাড়ির বড়ো কর্তা বনমালী সাহার হুকুম হলো কার্তিক-গণেশকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে। কোমর বাঁধলেন পটুয়া। সেদিন রাতেই স্বপ্নাদেশ পেলেন বনমালীবাবু। 'কার্তিককে ডানদিকে আর গণেশকে বাঁদিকে রেখেই করতে হবে সাহা বাড়ির সাহাবাড়ির দুর্গাপুজো'।

দেখতে দেখতে সেই পুজোই ১৮২ বছরে পদার্পণ করেছে। বাংলাদেশের পাবনা জেলা থেকে কোনও এক সময় সাহা পরিবার এসেছিল বালুরঘাটে। তারপর সেখানেই বসতি গড়ে তোলে সাহাদের একটি অংশ। ক্রমে তাঁদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। পরে তাদের বংশধরেরা কিছু জমিদারিও লাভ করেন। বনমালী সাহার প্রবর্তিত দুর্গাপুজো এখনও সাড়ম্বরে পালিত হয়। তবে সেই যে কার্তিক-গণেশের স্থান বদল হলো, আজও তাঁরা সেই স্থানেই বিরাজমান।

পরম্পরা মেনে সাহাদের পরবর্তী প্রজন্ম ১৮২ বছরের পুজোকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহাদের পুজো বালুরঘাটে সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। দেশভাগের পরেও বাংলাদেশ থেকে তাঁদের আত্মীয়স্বজন বালুরঘাটের দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করত। দুর্গাপুজোর দিনগুলোয় সাহা পরিবার মিলনমেলায় পরিণত হতো। এখন সময় বদলেছে। সেই জমিদারিও নেই। তবে পুজোর রীতি-রেওয়াজে বিন্দুমাত্র বদল ঘটেনি।

শুধুমাত্র প্রথাগুলোয় অপরিবর্তনীয় থেকে গেছে তা নয়। চমক রয়েছে আরও। সাহাবাড়ির দুর্গাপুজোর প্রতিমা সেই শুরুর দিন থেকেই একই কাঠামো তৈরি হয়ে আসছে। অর্থাৎ ১৮২ বছরে একবারের জন্য এ বাড়ির প্রতিমা তৈরির কাঠামো বদল করা হয়নি। তাদের প্রতিমা শিল্পীরা বংশ পরম্পরায় একই কাঠামোর ওপর ঠাকুর গড়েন। এ বাড়ির বর্তমান সদস্য কালীকৃষ্ণ সাহা জানালেন, 'প্রায় দুশো বছর আগে বনমালী সাহা বালুরঘাটের বিশ্বাসপাড়ায় এসেছিলেন ব্যবসার কাজে। এসেছিলেন জলপথে। এখানে বাড়িও তৈরি করেন। তারপর শুরু করেছিলেন দুর্গাপুজো। আজও নিয়ম-নিষ্ঠা সহকারে আমাদের সাহাবাড়ির দুর্গাপুজো

রূপে মায়ের আগমন

হয়ে আসছে।”

সাহাবাড়ির পুজোর আরেক বিশেষত্ব, এখানে কোনও অন্নভোগ হয় না। লুচি, মিষ্টি, ফল দিয়েই দেবীর পাঁচদিনের পুজো হয়। জমিদারির রমরমা থাকাকালীন প্রতিদিন শ'দেড়েক মানুষের পাত পড়ত ঠাকুর দালানের সামনে। এখন জমিদারি কমেছে, আর্থিক স্বচ্ছলতাও। আগে পুজোর প্রতিদিনই গান-বাজনার আসর বসতো। বাইরে থেকে আসতেন শিল্পীরা। এখন সেসব অতীত। এখন শুধু নিয়ম মেনে পুজোটুকু হয়। তবে স্বল্প আয়োজনের সেই পুজোতেও সাহাবাড়ির দুর্গোৎসবের জনপ্রিয়তা এতটুকু কমেনি। আজও বছর বছর সাহাবাড়ির পুজো দেখতে ভিড় জমে দুর্গাদালানে।

কালনার চৌধুরী বাড়ির চার হাতের দুর্গা

দশহাতে দশ অস্ত্রধারণ করে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন দেবী দুর্গা। তাই এই বাঙ্গলায় দশভুজা দুর্গার আরাধনার চল রয়েছে। তবে তবে বর্ধমানের কালনা শহরের কুলটি গ্রামের চৌধুরী পরিবারর দেবী দুর্গা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। তাদের দুর্গাপুজোয় প্রতিমার থাকে চারটি হাত। সময় বদলেছে, বদলেছে দিনকাল। পরিবর্তন এসেছে চারপাশের পুজোর ধরনেও। চারদিকে থিম পুজোর রমরমা। তা সত্ত্বেও পরম্পরাগতভাবে চলে রীতি রেওয়াজে একটুও খামতি দেয়নি চৌধুরীরা। ৩৬৩ বছর ধরে আজও প্রাচীন রীতি মেনে চারহাতের প্রতিমাকেই আজও পুজো করা হয় চৌধুরিবাড়িতে।

গোড়ায় এখানকার প্রতিমা ছিলেন দশভুজাই। জানা যায়, একবছর পুজোয় বিসর্জনের পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন মা দুর্গা। ছয়টি হাত সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। সেই থেকেই চৌধুরীদের দুর্গা চতুর্ভুজা। চারহাত বিশিষ্টা দেবী দুর্গাই পুজো পান শারদ মহোৎসবে। এখানকার পুজো আজও প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে মাটির দালানেই অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিকে অবশ্য পাকা দালান বা পুজো মণ্ডপে পুজো করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই কোনও না কোনওভাবে বাধা পড়ে। স্বপ্নাদেশ আসে। তাই পুরনো রীতি মেনে মাটির দালানেই পুজোর ক'টাদিন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বিরাজ করেন উমা।

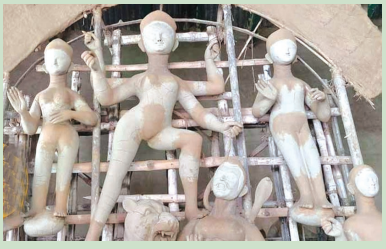

পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে যায় মহালয়া থেকেই। প্রতিপদে বসানো হয় দেবীর ঘট। সেদিন থেকেই শুরু পুজোর মূল পর্ব। সেদিনের পুজো দেখতে আশেপাশের বহু অঞ্চল থেকে মানুষ এসে ভিড় করেন। চৌধুরি পরিবারের সদস্য প্রকাশ চন্দ্র আঢ্য বলেন, 'আগে বলিপ্রথা ছিল। খুব জাঁকজমক করে বন্দুকের শেল ফাটিয়ে পাঁঠাবলি দেওয়া হতো। এখন আর হয় না। তবে প্রতীকী আখ আর কুমড়ো বলি হয়।” একসময় এখানকার পুজোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল কবির লড়াই। সারাদেশ থেকে প্রবাদপ্রতিম কবিরা আসতেন। পুজোর আসর মাতিয়ে রাখত কবিরাই। এখন সেসব আর হয় না। এখন বাউল-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে চৌধুরী বাড়ির পুজোর সময়।

ক্যানিঙের ভট্টাচার্য বাড়িতে পূজিতা হন কালো বরণ দুর্গা

মা দুর্গার মুখের বরণ কালো। গায়ের রং বাদামি। এই স্বরূপেই দেবী দুর্গার পুজো হয় ক্যানিঙের বনেদি ভট্টাচার্য পরিবারে। মায়ের স্বপ্নাদেশেই মায়ের এমন রূপের পুজো করে আসছেন ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্যরা।

বনেদি বাড়ির ভট্টাচার্য পরিবার একসময় বসবাস করত বাংলাদেশের বিক্রমপুরের বাইনখাড়া গ্রামে। সেখানে ভট্টাচার্য পরিবার ধুমধাম করে দুর্গাপুজো করত। কিন্তু ২৩০ বছর আগে হঠাৎ একদিন পুজোর সময় ঘটল অঘটন। দুর্গা মন্দিরের পাশেই মনসা মন্দির। আর পরিবারের প্রথা অনুযায়ী আগে মনসা মন্দিরে পুজো হবে। তারপর হবে দেবী দুর্গার পুজো। সেই মতো ঠাকুরমশাই মনসা মন্দিরের পুজো সেরে ফিরে আসার পর যখন মা দুর্গার পুজোয় বসলেন, সেই সময় হঠাৎ একটি কাক মুখে করে মনসা মন্দিরের প্রদীপের সলতে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সেই সলতে গিয়ে পড়ে দুর্গা মন্দিরের খড়ের চালে। সেদিন সেই সলতের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল গোটা মন্দির ও প্রতিমা। পরিবারের সদস্যরা ভাবলেন মা হয়তো আর পুজো নিতে চাইছেন না। পুজো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় ভট্টাচার্য পরিবার। কিন্তু পরের বছর পুজোর আগেই পরিবারের এক সদস্যকে মা জানান, তাঁর পুজো করতে হবে। কিন্তু মায়ের মুখের রং হবে কালো এবং গায়ের রং হবে বাদামি। সেই থেকেই 'কালো দুর্গা' পুজো হয়ে আসছে ভট্টাচার্য পরিবারে। বেশ কিছু বছর ধরে এই ভাবে দুর্গাপুজো হওয়ার পরে কোনও কারণবশত ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্যরা চলে আসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিঙে। তাঁরা বসতি গড়েন ক্যানিং ১ নং দিঘিরপাড় এলাকায়। সেখানেই দুর্গামন্দির স্থাপন করেন। বাংলাদেশ থেকে নদীপথে আনা হয় দুর্গামায়ের কাঠামো। সেই কাঠামোতে আজও দুর্গাপুজো পুরনো রীতি মেনে। জন্মাষ্টমীর দিন প্রতিমার ৪৩৬ বছর পুরনো কাঠামোর গায়ে মাটি ওঠে। চক্ষুদান হয় মহালয়ায়। মহালয়ার দিন একশোটা নারকেল নাড়ু তৈরি হয়। সেই নাড়ু পাঁচদিন ধরে মায়ের পুজোয় ফলমিষ্টি ভোগে দেওয়া হয়। এই পুজো দেখতে ক্যানিঙে এসেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারও। ■

অসমের দুর্গাপুজোয় নৈবেদ্যে দেওয়া হয় স্প্রাউট

চিন্ময়ী রায় দে

শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, বাঙ্গলার প্রতিবেশী রাজ্য অসমের রাজধানী শহর গুয়াহাটি-সহ কাছাড়, বদরপুর, করিমগঞ্জ, লামডিং, বরাক উপত্যকা, বঙাইগাঁও, মণিপুর এবং খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকা শিলঙে একই দৃশ্য চোখে পড়ে বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয়। উত্তরপূর্ব ভারতের এই অঞ্চলে বাঙ্গালিদের বাস, তাই পশ্চিমবঙ্গের মতো এই এলাকার মানুষেরাও মেতে ওঠেন দুর্গাপূজার আনন্দে। তবে দুর্গোৎসব এখানে শুধুমাত্র বাঙ্গালিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বাঙ্গালি, অসমীয়, মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবি-সহ সমস্ত হিন্দিভাষী হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষরাও এতে যোগদান করেন।

এই সময় মা দুর্গা হয়ে ওঠেন সকলের মা, তিনি তো জগৎমাতা। আর সকলের যোগদান এই পুজোকে এক অনন্য পরিপূর্ণতা দান করে। রাজ্যের ফ্যান্সি বাজার, গণেশ গুড়ি, এবিসি, জিএস রোড, চানমারি, জু রোড এবং বাঙ্গালি অধ্যুষিত এলাকা কালাপাহাড়ের বাজারগুলিতে উপচে পড়ে ভিড়। শপিংমলগুলির রমরমা হলেও ট্র্যাডিশনাল দোকান-বাজারও পিছিয়ে নেই। সাধারণ ব্যবসায়ীরাও পূজা উপলক্ষ্যে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে রীতিমতো আদাজল খেয়ে লেগে পড়ে। গণেশগুড়ি বাজারের এক কাপড় বিক্রেতা জানান, 'শপিংমল যতই জাকজমক আনুক, আমরাও পিছিয়ে নেই। মানুষের চাহিদা বুঝে নতুনত্বের সম্ভার বৃদ্ধির চেষ্টা করছি। শপিংমলকে টেক্কা দিতে না পারলেও হাল ছাড়বো না।'

করোনা অতিমারিকে মাথায় রেখে ভিড় এড়াতে গত দু' বছর দুর্গাপুজোয় বাহুল্য বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। করোনা ঠেকাতে রাজ্য সরকার যে নিয়ম নিষেধের তালিকা জনগণের হাতে ধরিয়েছিল, তা মেনে বড়ো পূজো করা ছিল অসম্ভব। কাজেই ছোটো প্রতিমা ও ঘট পুজো করেই ঘটিজলে গঙ্গাস্নান করেছে গুয়াহাটিবাসী। তাই গত বছর দোকানগুলিতে তেমন ভিড় চোখে পড়েনি বললেই চলে। এবছর আর বাধা নেই, তাই রাজ্যবাসীর মনে আনন্দের জোয়ার। তার মধ্যে দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর হেরিটেজের ঘোষণা আনন্দকে দ্বিগুণ করে তুলেছে। এবছর সেপ্টেম্বর আসার আগেই সন্ধ্যে নামতে না নামতে ফ্যান্সি বাজারে উপচে পড়ছে ভিড়। এই ভিড়ে লাগাম দিতে রাজ্য সরকার ফ্যান্সি বাজারে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছে। ভিড় দেখা যাচ্ছে মিষ্টি ও ফাস্টফুডের দোকানগুলিতেও। গুয়াহাটির ওদালবাক্রার বাসিন্দা রূপালি দাস জানান— 'গত দু'বছর তেমন পুজোর বাজার করা হয়নি বললেই চলে, এবার আগস্টের শেষেই বাজার করা শুরু করলাম।'

শাড়ি ছাড়া বাঙ্গালি মেয়েই হোক বা অন্য রাজ্যের মহিলা সবারই পুজো অচল। অসমে শাড়ি কেনার (বাঙ্গালি শাড়ি) জন্য আমাদের একমাত্র সম্বল বেঙ্গল হ্যান্ডলুম। যতোই মেখলা চাদর, শালোয়ার কুর্তি, জিন্সটপ কিনি, জামদানি ছাড়া পুজোর বাজার অসম্পূর্ণই থেকে যায়। গত দু' বছর বাইরে থেকে তেমন কোনো শাড়ি আসেনি। এবছর আবার বাজারে ঢাকাই জামদানির আনাগোনা চোখে পড়ছে। সঙ্গে আছে বাঙ্গলার ফুলিয়ার তাঁত, বালুচরি, বোম্বাই, কট্‌কির মতো সাবেকি শাড়ি নতুন শাড়ি। যতই বাজারে আসুক না কেন, এইসব শাড়ির চাহিদা বরাবরই বেশি বলে জানালেন বেঙ্গল হ্যান্ডলুমের কর্ণধার।

শহরের রেহাবারি, উলুবারি, লালগণেশ, কালাপাহাড়, ভাক্কর নগর, ওদালবাক্রা এলাকাগুলি বাঙ্গালি অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় পুজার কটাদিন এইসব এলাকাকে বাঙ্গলার বাইরে বলে মনেই হয় না। তবে অসমের পুজোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো, পুজো কম বাজেটের হোক বা বেশি বাজেটের, পুজোর কটাদিন পাড়ার সকলে এক সঙ্গে বসে দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করেন। খিচুড়ি, লুচি, পায়েস, লাবড়া, মিষ্টি, চাট্‌নি তো সাধারণ মেনু, যাদের বাজেট বেশি তারা আবার পোলাওয়ের বন্দোবস্ত করেন। রেহাবারি বিলপার কালী মন্দির সংলগ্ন পূজা কমিটির এক সদস্য বলেন, 'সারা বছর আমরা নিজেদের নিয়ে, নিজেদের পরিবার নিয়েই ব্যস্ত থাকি, অনেকে বাইরেও থাকেন। পুজার জন্যই বাড়ি ফিরে আসেন সবাই। এই পুজোর কটাদিন মধ্যাহ্নভোজ এক সঙ্গে করলে সকলের সঙ্গে দেখা তো হয়।'

তবে বাঙ্গলার বাঙ্গালিদের পুজার সঙ্গে অসমের বাঙ্গালিদের পুজার কিছুটা পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন নৈবেদ্যে চালকলার পরিবর্তে আরাধ্যা দেবীকে নিবেদন করা হয় স্প্রাউট। একটু স্পষ্ট করে বললে— কাঁচা ছোলা, অঙ্কুরিত মুগ, সঙ্গে নুন দিয়ে মাখা আদাকুঁচি, খোসা সমেত কাটা ফল। আগত দর্শনার্থীদের জন্য এই প্রসাদের বন্দোবস্ত করা হয়। দেবীর দু'পাশে মোচা ও কলা-সহ কলাগাছ এখানকার পুজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে একটা। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাঙ্গালিদের সঙ্গে স্থানীয়রাও এই কটাদিন আনন্দে মেতে ওঠেন।

(লেখক গুয়াহাটির এক বাঙ্গালি গৃহবধূ)

কৈলাস বোস স্ট্রিটে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর কলকাতার এক সুপরিচিত জনপদ 'কৈলাস বোস স্ট্রিট'। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক স্যার কৈলাস চন্দ্র বোসের নামাঙ্কিত এই রাস্তার বিস্তৃতি পশ্চিমে বিধান সরণি থেকে পূর্বে রাজা রামমোহন সরণি। আগে এই রাস্তার নাম ছিল সুকিয়া স্ট্রিট। ৪১ নম্বর কৈলাস বোস স্ট্রিটে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দেড় শতাধিক বছরের বসবাস এবং একই সঙ্গে দুর্গাপূজাও। এই পারিবারিক দুর্গাপূজা উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত পুজোগুলির অন্যতম। এই প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ দুর্গাপুজোর ইতিহাস জানতে শ্রাবণের এক অপরাহ্নে হাজির হয়েছিলাম চট্টোপাধ্যায় বাড়িতে। দুর্গাপুজোর আচার-অনুষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শোনালেন বাড়ির প্রবীণতম সদস্য, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক সুপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়।

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজো কবে শুরু হয়েছিল, সঠিক জানা না গেলেও, পুজোর বয়স যে সার্ধ শতাধিক বছর অতিক্রান্ত, সেই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কেননা বর্তমান প্রজন্ম ছয় পুরুষ ধরে পুজোর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

দুর্গাপুজোর বর্ণনায় যাওয়ার আগে চট্টোপাধ্যায় পরিবার সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এদের আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশে খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, এই সেনহাটি গ্রামেই জন্ম বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের। পরিবারের আদিপুরুষ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় কুলদেবতা 'শ্রীধর জীউ'কে নিয়ে খুলনা থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং চোরবাগান (মুক্তারামবাবু স্ট্রিট) অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের সন্তান হরমোহন চট্টোপাধ্যায় আনুমানিক ১৭০ বছর আগে ৪১ নম্বর কৈলাস বোস স্ট্রিটে (পূর্বতন ৬৭ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিট) ১৪৫৪ টাকায় তিন খিলানের ঠাকুরদালান-সহ বাড়ি ক্রয় করে দুর্গাপুজোর সূত্রপাত করেন, অবিচ্ছিন্নভাবে যা আজও অব্যাহত। ঠাকুরদালানের মেঝে গঙ্গামাটি দিয়ে নির্মিত। হরমোহন প্রেসিডেন্সি কলেজে গ্রন্থাগারিক পদে কর্মরত ছিলেন। তদানীন্তন ভাইসরয়ের সঙ্গে তার হৃদ্যতা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সুভাষচন্দ্র বসু ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পদার্পণ ঘটেছে এ বাড়িতে।

হরমোহনের দশ কন্যাসন্তান ছিল। বিবাহের পরে কন্যারা স্বামী ও সন্তানসন্ততি-সহ পিত্রালয়ে বাস করতেন এবং এদের সকলের ভরণপোষণ করতেন হরমোহন। কন্যারা ছিল হরমোহনের কাছে স্নেহেধন। সম্ভবত এই চিন্তাভাবনা থেকেই চট্টোপাধ্যায় পরিবার দেবী দুর্গার আরাধনা করেন মাতৃরূপে নয়, কন্যা রূপে।

দুর্গাপুজো শুরুর নেপথ্যে এক চমকপ্রদ ঘটনার কথা জানা যায়। হরমোহন একদিন কথা প্রসঙ্গে তার বৈমাত্রেয় ভাই রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান)-কে বলেন— 'আমি নতুন বাড়ি কিনে দুর্গাপুজো করবো এবং বিজয়া দশমীর দিন তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে মা-কে গঙ্গায় নিয়ে যাব'। বলা যেতে পারে, একরকম জেদের বশে হরমোহন বাড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন।

জন্মাষ্টমীতে প্রতিমার কাঠামো পুজো হয়। অনেক আগে ঠাকুরদালানেই প্রতিমা গড়া হতো। দ্বিতীয়াতে কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা বাড়িতে আনা হয়। আগে ছিল মাটির সাজ। এখন ডাকের সাজের প্রতিমা। এক চালচিত্রে দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী সপরিবারে অধিষ্ঠিতা। দেবী দুর্গার গাত্রবর্ণ অতসী ফুলের মতো। বাহন শ্বেতবর্ণের। অসুরের গায়ের রং সবুজ। প্রতিমার উচ্চতা সাবেক পাঁচ পোয়া। কুমোরটুলির একই মৃৎশিল্পী-পরিবার পুরুষানুক্রমে প্রতিমার রূপদান করছেন।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবীর অধিবাস ও বেলবরণ। সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকার স্নানপর্ব বাড়িতেই সম্পন্ন হয়। যিনি ব্রতী হন, তিনি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে সকালে পুজো শুরুর আগে বাড়ির প্রবেশ পথ থেকে দেবীঘট পর্যন্ত দণ্ডপ্রণাম করেন। পুজোর তিনদিন সকালে গরম জল ও বেলগাছের ডাল দিয়ে মা-র মুখ প্রক্ষালন করা হয়। অষ্টমী ও সন্ধিপুজোয় 'ধুনো পোড়ানো' চট্টোপাধ্যায় পরিবারের এক প্রাচীন রীতি। মা-র কাছে কোনও মনস্কামনা থাকলে বা পারিবারিক মঙ্গল কামনায় মহিলারা এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সন্তানের মঙ্গলার্থে মহিলাদের 'কল্যাণী পুজো' মহাষ্টমী-র একটি অন্যতম অঙ্গ। পুজো হয় 'বৃহদ্ নন্দীকেশ্বর পুরাণ' মতে।

মহাষ্টমী-তে কুমারী পুজো ও সধবা পুজো চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনূর্ধ্বা নবম বর্ষীয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেবীজ্ঞানে পুজো করা হয়। অনুরূপভাবে একজন ব্রাহ্মণ পত্নীকে নতুন কাপড়, আলতা, সিঁদুর পরিয়ে পুজো করা হয়। সন্ধিপুজোয় বলির পর ঠাকুরদালানে জ্বলে ওঠে ১০৮ প্রদীপের দীপমালা।

শাক্তমতে পুজো হয় বলে ছাগ বলি ও আমিষ ভোগের প্রথা আছে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী-তে দেবীকে দু'বার ভোগ নিবেদন করা হয়। প্রথম ভোগে থাকে— খিচুড়ি, পাঁচ রকম ভাজা, পারশে মাছ ভাজা, পেপের চাট্‌নি, পায়েস, দই, মিষ্টি, পান। এরপর হয় ভোগারতি ও পুষ্পাঞ্জলি। অঞ্জলির পর চণ্ডীপাঠ হয়। চণ্ডীপাঠের পর দ্বিতীয়বার ভোগ নিবেদন করা হয়। এই ভোগ 'ছত্রভোগ' নামে পরিচিত।

'ছত্রভোগ'-এ থাকে— সাদা ভাত, শুক্তো, তেওটির ডাল (পাঁচ রকম ডালের মিশ্রণ), পাঁচ রকম ভাজা, মাছের ঝোল, লাউ চিংড়ি, চাট্‌নি, পায়েস দই, মিষ্টি, পান। অষ্টমী ও নবমীতে অতিরিক্ত ভোগ দেওয়া হয় যথাক্রমে শোলমাছ পোড়া ও জলসিঙ্গাড়ার ডালনা। সন্ধিপুজোর ভোগে থাকে লুচি ও বেগুন ভাজা। ভোগ রান্না করেন পরিবারের দীক্ষিত মহিলারা। রান্না হয় গঙ্গাজলে।

নবমীর সকালে যথাবিহিত পুজো, পুষ্পাঞ্জলি ও হোমের পর পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান করে দুর্গাপুজোর সমাপন। ষষ্ঠী থেকে নবমী প্রতি সন্ধ্যায় হয় শীতল।

বিজয়া দশমীতে পঞ্চোপচারে 'অপরিজিতা'র পুজো ও আরতির পর পরিবারের সদস্যরা ঠাকুরদালানে প্রতিমাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। এদিন মা দুর্গাকে পান্তাভাত, কচু শাক, নারকেল কুম্‌ড়ি, মসুর ডাল, দই, মিষ্টি, পান ভোগ দেওয়া হয়। এই বাড়িতে মহিলারা বিজয়া দশমীতে সিঁদুর খেলেন না, খেলেন অষ্টমী ও সন্ধিপুজোয়। কুলদেবতা শ্রীধর জীউ ও দামোদর জীউ চারদিন সহাবস্থান করেন মা দুর্গার সঙ্গে ঠাকুরদালানে।

বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় বরণ করে ও কণকাঞ্জলি দিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশে প্রসন্ন কুমার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। আগে কাঁধে নিয়ে যাওয়া হতো। নিরঞ্জনের পর বাড়ি ফিরে গৃহদেবতার আরতির পরে শান্তিজল গ্রহণ, পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়, কলাপাতায় 'দুর্গানাম' লেখা ও মিষ্টিমুখ করে দুর্গোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কোনও ট্রাস্ট নেই, পুজোর ব্যয় নির্বাহ হয় পরিবারের সদস্যদের সমবেত সহযোগিতায়। পুজোর কদিন প্রতিমা দর্শন করতে চট্টোপাধ্যায় বাড়িতে বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়। জাঁকজমকের আধিক্য না থাকলেও পুজোটি অত্যন্ত নিষ্ঠা, ভক্তি ও শুদ্ধাচারে সম্পন্ন হয়। □

দুর্গাপুজো বাঙ্গালিদের মিলনমেলা

ড. মঞ্জু সরকার

শরৎ আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। মাটির বুকে শিউলি ও কাশফুলের মেলা জানিয়ে দেয় মায়ের আগমন বার্তা। ঋতুবৈচিত্র্যে শরৎ আসে শান্ত-সৌম্যরূপে। এই অস্থির ব্যস্ত সময়ের বুকে যেন এক মৃদু হিল্লোল। প্রকৃতির এই মোহনীয় মুহূর্তে দেবী আসেন, অশুভ শক্তির অবলুপ্তি ঘটিয়ে শুভবোধের জাগরণ ঘটাতে। জীবের দুর্গতি নাশ করে তিনি হয়েছেন দুর্গা। আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শিবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা নামেও তিনি পূজিতা। তবে দুর্গাপূজার সঙ্গে মিশে আছে বাঙ্গলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ধর্মীয় উৎসবের গণ্ডী ছাড়িয়ে পারস্পরিক সহমর্মিতা, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হবার উপলক্ষ্য দুর্গাপূজা। তাই এই উৎসব সর্বজনীন। সেলফোন ও মেট্রোরেলে অভ্যস্ত আমাদের জীবনে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ১০০ বছরের পুরনো পুজোর অনেক কিছুই হয়তো লুপ্ত হয়ে গেছে। তবু যেটুকু বেঁচে আছে তাতেই আজও আমরা সেরা।

১৮৪২, ১৮৭৫, ১৯০২ সালের দুর্গাপূজা বাদ দিলে দিল্লিতে প্রথম দুর্গাপূজা হয়েছিল চাঁদনীচক এলাকায় বল্লী মারানের রোশনপুরা কালী মন্দিরে ১৯১০ সালে। তবে ঘটপূজা হয়েছিল। পরের বছর ১৯১১ সালে প্রথম মূর্তিপূজা হয়েছিল চাঁদনীচকের লালা লছমী নারায়ণের ধর্মশালায়। প্রতিমা এসেছিল বারাণসী থেকে। কাশ্মীরি গেটের পুজোর প্রতিমাও এসেছিল বারাণসী থেকে। সে সময় দুর্গাপুজোর নামে কেউ নাক সিটকায়নি বা ভুরু কোঁচকায়নি। বরং 'লালাজীরা যত্নবান হতেন পুজোর পবিত্রতা যাতে বজায় থাকে এবং মহিলাদের বিন্দুমাত্র যাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। আরও শোনা গেছে, দশমীর দিন যে পথ দিয়ে ভাসান যাবে, আশেপাশের ব্যবসায়ীরা এলাকাটাকে নিজেদের খরচে সাজিয়ে দিতেন। এর মধ্যে একটা উল্লেখনীয় ঘটনা ঘটল। সরকারি ছাপাখানা কলকাতা থেকে দিল্লি স্থানান্তরিত হলো সিভিল লাইন্স এলাকায়। দুটো থেকে পুজো হয় তিনটে। এরপর ১৯১৪ সালে সরকারি আবাসন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুজোও প্রসারিত হয় তিমারপুর, গোল মার্কেট, মিন্টোরোড, লোদি রোড, বিনয় নগর, চিত্তরঞ্জন পার্ক, গোবিন্দপুরী, কালকাজী, করোলবাগ, বিডনপুরা, মোতিবাগ, নিবেদিতা এনক্লেভ ও দেবনগরে। এরপর সময় যত পার হয়েছে অন্তর্কলহের দরুনই হোক বা অন্য কারণে, পুজোর সংখ্যাও বেড়েছে। এখন ছোটো-বড়ো মিলিয়ে ৪০০-র বেশি পুজো হয় দিল্লিতে। সরিতা বিহার, পাণ্ডব নগর, গণেশ নগর, গ্রেটার কৈলাশ, সিআর পার্ক (মোটামুটিভাবে মিনি কলকাতা)-এর বি-ব্লক, ডি-ব্লক, মেলা গ্রাউন্ড, কো- অপারেটিভ, মিলন সমিতি, পকেট ৪০ নবপল্লী,

শিবমমন্দির/ কালীবাড়ির পূজাই বিখ্যাত।

অবশ্য আগের ভাব আর নেই। তখন দল বেঁধে প্রতিমা গড়া দেখতে যাবার আগ্রহ, উত্তেজনা এবং একসঙ্গে 'বোলো বোলো দুর্গা মাই কী জয়' বলে আকাশ বাতাস ধ্বনিত করার প্রবণতা ছিল। যা অবাঙ্গালীদেরও কাছে টানতো। গণেশের পেট, অসুরের পেশি, আক্রমণোদ্যত সিংহ সবই তখন ছিল আলোচনার বিষয়। পুজো প্যান্ডেলে বোধন-প্রসাদ-ভোগ-অঞ্জলি-সন্ধ্যা আরতি, বসে আঁকো, আনন্দমেলা, সিনেমা, বিচিত্রানুষ্ঠান, নাটক, থিয়েটার সবই ছিল। ঢাকির দল অপেক্ষা করতো।

তারপর পাঁচদিন মনের সমস্ত আবেগ ঢেলে দিত ঢাকের তালে। ফিরে যেত আগামীতে আবার আসার স্বপ্ন নিয়ে। ওঁরা আজও অপেক্ষা করে। তবে ঢাকি বায়না বেশি চাইলে প্রযুক্তির দৌলতে ক্যাসেট চালিয়ে কাজ সারে অনেক পূজা কর্তৃপক্ষ। পুরোহিতমশাই এখনো আছেন। অদূর তবিষ্যতে হয়তো সেটাও অনলাইন হয়ে যাবে।

এখনো বিচিত্রানুষ্ঠানে নাচ, গান, কবিতা পরিবেশিত; বাতাসে, বাউলের সুর ভাসে। প্রতিটি প্যান্ডেলে প্রসাদ বিতরণ, অঞ্জলি, সিঁদুর খেলা সবই হয়। তবে ধরন বদলেছে। সবাই বাঙ্গলার মাটির সেই টান থেকে যেন দূরে সরে যাচ্ছে। পূজায় রাজনীতি জগতের কেষ্টবিষ্টুদের আনাগোনা বাড়ছে। খরচের একটা মোটা অঙ্ক যে তাঁদের পকেট থেকেই আসে। এতেই খোসামোদের জোর বাড়ছে। আন্তরিকতা কমছে। কেবল যাঁরা উদ্যোক্তা, আনন্দটাও যেন ওদেরই। বাকিরা কেবল দর্শক।

কোটি কোটি টাকা চাঁদা ওঠে একটি একটি পুজোতে। তা দিয়ে আমরা নাচ, গান, নতুন ফ্যাসনের জামা-কাপড়, সাজগোজের বাহার ও পানীয়ের ফোয়ারা ছোটাতে পারি, শুধু পারি না একজোট হতে। পারি না নিজের বদলে যোগ্য কাউকে সম্মান দিতে। আর তারই ফলস্বরূপ পরিশ্রমী কর্মীরা তাদের ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হতে হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। হয়তো নতুন পূজোমণ্ডপ গড়ে তুলছে। নতুবা নিজেদের সরিয়ে নিয়ে অবাঙ্গালিদের সঙ্গে গিয়ে মিশছে। স্বভাবতই পোশাক থেকে পুজোর পদ্ধতি, মহিমা ও সংস্কৃতি সব পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের এই পরিবর্তন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে ব্যর্থতার আভাস দিয়ে চলেছে। এর ভালো-মন্দের বিচারে যাচ্ছি না। আবার এটাও বলবো না 'বিদ্রোহী আমি রণক্লান্ত'। বরং যাঁরা আমাদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে প্রয়াসী তাঁদের সাধুবাদ। তাঁদের পাশে থেকে সকলকে উৎসাহিত করার সংকল্পে ব্রতী আমরা। অন্য রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিরা মিলিত হয়ে স্বাধীনতার অমৃত বর্ষে বঙ্গ-বিভাজনের গ্লানিকে দূরে সরিয়ে আবার একত্রিত হই মায়ের আরাধনায়। ঢাকের তালে, মায়ের বোধনে, আরতিতে, নতুন পোশাকে, সপরিবারে নতুন প্রজন্ম-সহ মায়ের কাছে ঐক্যবদ্ধ প্রার্থনা করি— অশুভ শক্তির বিনাশ হোক, শুভ শক্তির আগমনী বার্তা ধ্বনিত হোক আকাশে বাতাসে। আমরা যেন দ্বিজেন্দ্রলালের মতো গাইতে পারি— 'বঙ্গ আমার! জননী, আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ!'

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক)

মায়ের হাসিমুখ সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়

অঞ্জন অধিকারী

আর তো মাত্র কটাদিন, এসে গেল বাঙ্গালির সেরা ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব দুর্গাপূজা। পাঁচজন বাঙ্গালি একটা জায়গায় বসবাস করলেই তাদের মনে বাসনা জাগে একটা কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করার বা একটা দুর্গাপুজোর আয়োজন করার। কলকাতা তথা বাঙ্গলার বাঙ্গালিরা পুজো নিয়ে মেতে উঠতে ভালোবাসে। পুরো একটা বছর পার করে ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক হয়ে মেতে ওঠে প্যান্ডেল, লাইটিং, প্রতিমা ও মণ্ডপ সজ্জায় অন্য রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিরাও এ ব্যাপারে একদমই পিছিয়ে থাকে না। আজ থেকে ১৪৩ বছর আগে নাগপুরের পুলিশ প্রধান পি.কে. চক্রবর্তী প্রথম তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন। যে পুজো এখনও তাঁর বাড়িতে সেভাবেই সমস্ত নিয়ম মেনে চলে আসছে। নাগপুরে এখন অনেকগুলি পুজো হয়, তার মধ্যে প্রধান পুজো ১০৬ বছরের পুরনো ধান্তোলী বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের পুজো। পুজো হয় স্কুল বিল্ডিঙে, একচালা সাবেকি প্রতিমায়।

এখানকার পুজোর আরেকটি আকর্ষণ হলো স্কুলের মাঠে এগারো দিনব্যাপী মেলার আয়োজন। মেলা থেকে অর্জিত টাকা স্কুলের কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও আছে অজনী রেলওয়ে কলোনি, মোতিবাগ, অভ্যঙ্কর নগর দুর্গোৎসব, পশ্চিম নাগপুর দুর্গাপূজা, কাটোল রোড দুর্গোৎসব, এয়ারফোর্স অ্যান্ড অম্বাঝারী ডিফেন্স প্রজেক্টের পুজো। আম্বাঝারি বঙ্গীয় সংসদের পুজো। আম্বাঝারী বঙ্গীয় সংসদের পুজোর সূত্রপাত হয় ১৯৭০ সালে, কিছু বাঙ্গালি ডিফেন্সের কর্মীর উদ্যোগে একটি খালি মাঠে। তখন তাদের ছিল না কোনও নিজস্ব বিল্ডিং। পরে ১৯৭৮ সালে বাঙ্গালি কর্মীদের উদ্যোগে এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সহায়তায় কেন্দ্রীয় সরকার একটি জমি ডিফেন্স এস্টেটের মধ্যে সংসদকে অর্পণ করে, যেখানে গড়ে ওঠে বঙ্গীয় সংসদের নিজস্ব বিল্ডিং ও পূজামণ্ডপ। সেই মণ্ডপে এখন পুজো হয়। এছাড়া গড়ে ওঠে একটি বাংলা লাইব্রেরি। গড়ে ওঠে একটি নাটকের স্টেজ, যে স্টেজে পুজোর সময় বাঙ্গালিরা নাটক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে।

পুজো হয় নিয়ম মেনে। পিতৃপক্ষের শেষে

পূজার কটাদিন মনে হয় যেন বাঙ্গলাতেই আছি

আরতি দে সরকার

আমি গুজরাটের সুরাটে থাকি। তাই সুরাটের দুর্গা পুজোর অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে শেয়ার করছি। বাঙ্গলায় যেমন এই সময় দুর্গা পুজো হয় গুজরাট তথা পশ্চিম ভারতে এই সময় নবরাত্রি উদ্‌যাপন হয়। কাজেই উৎসবের মেজাজ এখানেও কম থাকে না।

সুরাটে বেঙ্গল ক্লাবের পুজো আমরা কলকাতার মতোই উপভোগ করি। বাঙ্গলায় যেমন এই সময় সব অফিস ছুটি থাকে তেমন এখানে থাকে না। ফলে পুরো দিন রাত ঘুরে ঠাকুর দেখার সুযোগ থাকে না। পুজে দেখা শুরু হয় বিকেলে অফিস শেষ হওয়ার পর। ষষ্ঠীর দিন থেকে শুরু হয় প্যান্ডেল হপিং আর খাওয়াদাওয়া। প্রতিমা দেখে ফিরে তারপর নিজের ক্লাবের পুজোতে এসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, গল্প, তার মধ্যে কিছু সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম থাকলে তাতে অংশগ্রহণ করা। এই ভাবেই পুজোর দিনগুলো ভালোই কেটে যায়। তবে অষ্টমী, নবমী, দশমী প্রায় সবাই ছুটি নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। অষ্টমীতে সকলে সেজেগুজে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া, তার পর প্রসাদ নিয়ে বিকেলে নানান অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা, নবমীতে পুজো দেখা, ছোটোদের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান— এসব করে দিনগুলো সুন্দরভাবে কেটে যায়। দশমীতে সিঁদুর খেলা, তারপর প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে শেষ হয় এই কটিদিনের আনন্দ উৎসব। বাঙ্গলার মতো এখানে থিম পুজো বা হাইফাই বাজেটের পুজো হয় না। কিন্তু যারা, আমরা বাঙ্গলায় ফিরতে পারি না তাদের সবাই একসঙ্গে এই পুজোর আনন্দ উপভোগ করে কিছু সময় কাটানোর মধ্যে ভুলেই যাই যে আমরা বাঙ্গলা থেকে এতো দুরে রয়েছি। পুজোর কটাদিন আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি— মা যেন প্রতি বছর এ ভাবেই আমাদের জীবনে আনন্দ নিয়ে আসেন।

(লেখক সুরাটের বাঙ্গালি গৃহবধূ)

দেবীপক্ষের শুরুতে মহালয়ার ভোরে সংসদের বিল্ডিং থেকে মাইকে ভেসে ওঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীপাঠের সুর। তারপর ষষ্ঠীর সকালে বেলগাছের তলায় ঘট প্রতিষ্ঠা করে ষষ্ঠীপুজো হয়। গৃহিণীরা সকালে স্নান করে সন্তানের মঙ্গল কামনায় পুজো দেন। সন্ধ্যায় নবপত্রিকা ও দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় ঢাকের বাজনার সঙ্গে। ঢাকি আসে গ্রামবাঙ্গলা থেকে। সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপুজো ও নবমী পুজো হয় যথাযথ রীতি মেনে। প্রত্যেকদিন দুপুরে মাকে ফল মিষ্টি ছাড়াও ভোগ নিবেদন করা হয়। ভোগে থাকে খিচুড়ি, ভাজা সবজি, চাটনি আর পরমান্ন। সন্ধিপুজোর সময় এক একজন গৃহিণী এক একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে মোট ১০৮টি প্রদীপ জ্বালান। দশমীর দিন সকালে পুজোর শেষে আনুষ্ঠানিক বিসর্জনের পর সিঁদুর খেলা শুরু হয় এবং সন্ধ্যাবেলা হয় প্রতিমা বিসর্জন শোভাযাত্রা সহযোগে। এছাড়া পুজো মণ্ডপের পাশে অনেক স্টল তৈরি হয় সেখানে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা সবাই মেতে ওঠে কাটলেট, এগরোল, মাটনরোল, বিরিয়ানি ও আইসক্রিমের আনন্দে। পুজোর সময় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দুপুরে বিভিন্ন দিনে থাকে খিচুড়ি, লাবড়া, লুচি, তরকারি, ছোলার ডাল, মিষ্টি, চাটনি সহযোগে পঙক্তিভোজ। পুজোর চারটিদিন সবাই মিলে একটা পরিবার হয়ে গিয়ে পুজোর মাঠেই সবাই খাওয়াদাওয়া করে। এছাড়া নতুন সাজপোশাক পরা, ঠাকুর দেখা, অঞ্জলি দেওয়া এসব নিয়েই মেতে থাকে। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা থাকে নাটক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কলকাতা থেকে শিল্পীরা আসেন অনুষ্ঠান করতে। দশমীর দিন সন্ধ্যাবেলা প্রতিমা বিসর্জনের পর শান্তিজল নেওয়া ও বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। পুজোর কটাদিন থাকে আরও কিছু অনুষ্ঠান যেমন আবৃত্তি, প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ধুনুচি নাচ, শঙ্খনাদ প্রতিযোগিতা, এই উৎসবে ছোটো ও বড়োরা অংশগ্রহণ করে আনন্দ উপভোগ করে।

পুজোর কটাদিন ডিফেন্সের সমস্ত বাঙ্গালি ও অবাঙ্গালি পরিবার (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত) একত্রিত হয়ে একই পরিবারের মতো আনন্দ উপভোগ করে দিনগুলো কাটিয়ে দেয় এবং সমস্তরকম ভেদাভেদ ভুলে মায়ের পুজোয় মেতে ওঠে।

(লেখক নাগপুরে কর্মরত বাঙ্গালি)

অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির বিজয় বিজয়াদশমী উৎসব

ড. প্রণব কুমার বর

ইতিহাস সেটাই, যা জানলে আমরা নিজেদের অতীতকে জানতে পারি, নিজের অতীতের সঙ্গে গর্বের ও পরাক্রমের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি। আমরা আমাদের নিজেদের পূর্বজদের দ্বারা, আমাদেরই জন্য নির্মাণ করে যাওয়া যে তন্ত্র, সেই স্ব-তন্ত্রকে রক্ষা করতে পারি। ইতিহাসকে তাই বার বার স্মরণ করতে হয়। স্ব-কে স্মরণ করে স্বতন্ত্রের বলবর্ধনের দ্বারাই এদেশ চিরঞ্জীবী হয়ে আছে।

এই তো সেদিন হিন্দুমেলা, শিবাজী উৎসব ইত্যাদির প্রচলন করলেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ। ধীরে ধীরে সমাজে বারোয়ারি দুর্গাপূজা, গণপতিপূজা ইত্যাদি নানান পালাপার্বণের প্রচলন হলো। সুপ্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে নানান তিথিতে নানান তীর্থক্ষেত্রে কত শত যাত্রা আমাদের সমাজটাকে যেন নতুন প্রাণে সিঞ্চিত করে থাকে।

অথচ উৎসব, পালাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি যদি কেবল খাওয়াদাওয়া, মৌজমস্তি, আমোদ-প্রমোদের জন্যেই হতো, তবে 'ব্যসন'কে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন মনে করতেন না আমাদের পূর্বপুরুষেরা। সমগ্র সমাজের প্রাণশক্তিকে জাগ্রত রাখার জন্যে এমন সব উৎসবগুলো যুগ যুগ ধরে সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে পালিত হয়ে এসেছে। এই সকল পালাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান আমাদের স্ব-কে জাগ্রত করে রেখেছে। এই অনুষ্ঠানগুলি যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ঠিক শ্রীরামচন্দ্র যেদিন রাবণকে বধ করেছিলেন সেদিনটাই ছিল বিজয়া দশমী তিথি। তার ঠিক পনেরো দিন পর অযোধ্যা ফেরার দিনটা ছিল দীপাবলী। এই সব ঐতিহাসিক দিনগুলিকে আমরা নানান উৎসবের মধ্যে দিয়ে স্মরণে রাখি ও পালন করি।

আলোর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের অবস্থানের মতো অশুভশক্তি কালের পরিণতিতে বারবার শক্তি সংগ্রহ করে বাড়তে থাকে। তাই শুভশক্তির জাগরণ ঘটাতে হয় প্রতিবার। সেই স্ব-তন্ত্রতাকে রক্ষার জন্য দেশ ও কালের প্রয়োজনে এদেশে মহানায়কদের বার বার আবির্ভাব হয়েছে। কখনো রাম, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ আদিদের মতো একক নায়ক রূপে এই দেশ এই সমাজকে রক্ষা করেছেন তাঁরা, কখনও-বা নৃসিংহের মতো সামূহিক শক্তিতে। কেবল পুরুষেরাই নয়, এদেশের নারীরাও মহানায়িকা রূপে বার বার সমাজকে রক্ষা করেছেন, বিনাশ করেছেন মানবতার শত্রুদের। সেই সব নায়িকারা কখনো দুর্গা, কালী, ছিন্নমস্তা কখনো-বা চামুণ্ডা রূপে শত্রু সংহার করেছেন। সেই পরম্পরা আজও বর্তমান। সমাজ তাঁদের দেবতার মর্যাদা দিয়েছে। এই সকল ঐতিহাসিক পুরাকথা নানান কাব্যিক কথকতার চিত্তাকর্ষক মোড়কে রঞ্জিত হয়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি গ্রন্থে নিবদ্ধ হয়েছে।

কখনো জলস্ফীতির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত হলে মানব সমাজ রক্ষার জন্য যারা রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তারাই তো মৎস্য অবতার। সেই নায়কেরা এতটাই জলজ পরিবেশে শক্তিমান ছিলেন যে, তাদের মৎস্য বলে পরিচয় অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সেকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মানব সমাজকে তারা রক্ষা করেছিল। কখনো শ্রীহীন শক্তিহীন সমস্ত লোককে শ্রীযুক্ত শক্তিযুক্ত লক্ষ্মীবান করতে জীবনসমুদ্র মন্থনের আধার হয়ে যাঁরা ধারণ করেছিল তারাই ছিলেন কূর্ম। কঠিন আত্মশক্তির আবরণের অথবা ধীর-স্থিরতার কারণে কূর্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন সেই নায়কেরা। তার পরে সমাজে অনৈতিকতা ও অপরাধ প্রবণতা বেড়ে অস্থিরতা দেখা দিলে, নায়ককেও নারীর সম্মান ও সমাজ তথা রাষ্ট্ররক্ষার জন্য বরাহের মতো কদর্য হতে হয়েছিল। বৈদেশিক আসুরিক আক্রমণকারী স্বৈরাচারী শক্তি যখন নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করেছে বলে মনে করে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে ও স্তম্ভের মতো সহনশীল নরনারায়ণকে পীড়িত অপমানিত করে পদাঘাত করে, তখন নিরস্ত্র নরেরা সিংহ রূপ ধারণ করেন, ধ্বংস করেন স্বৈরাচারী শাসককে এবং নরনারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রহ্লাদকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন সেই গণঅভ্যুত্থানের নায়কেরা। এর পরে যখন রাজশক্তিই সমাজের রক্ষক থেকে ভক্ষকে পরিণত হয় তখন শিক্ষক সমাজ বার বার অস্ত্র ধারণ করে অত্যাচারী রাজাদের শক্তি খর্ব করতে থাকে। একবার বা দু'বার নয়, এক এক করে একুশবার বাহুবলী সহস্রার্জুন সম ক্ষত্রিয়দের নিধন করেন যে নায়ক তিনিই তো পরশুরাম। এর ফল হয় আরও ভয়ংকর। সমাজ হীনবীর্য হয়ে পড়ে, আর রাক্ষুসে প্রবৃত্তিকে পালন পোষণ করতে থাকে রাবণের মতো দুরাত্মারা।

রাক্ষুসে প্রবৃত্তির প্রসার যখন প্রবল পরাক্রান্ত হয়েছিল এবং তাদের কেন্দ্রীয় শক্তি যখন রাবণ হয়ে উঠেছিল, তখন কেবল রাবণকে বধ করলেই তা সমাপ্ত হবে না— এটা আমাদের সমাজের মানবিক ও সজ্জন সমাজচালক মুনিঋষিরা জানতেন। তাইতো আমরা মুনি ঋষিদের যেন সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে দেখি। সেইকালে শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা যে যাত্রা করতে দেখি অরণ্য পর্বত গিরি গুহা কন্দরে— তা যেন ধীরে ধীরে কোনো এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধেয়ে চলে। ঋষি মুনি, সাধু সন্তেরা যে কোনো এক অনিবার্য কাজের তাগিদ অনুভব করেছিলেন। সকলেই যেন রামচন্দ্রের পথ চেয়ে বসেছিলেন। সেইসব দৈবীশক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিজয়া দশমীতে পরিণতি পেয়েছিল রাবণ বধ ও রাক্ষুসে প্রবৃত্তির সমূলে বিনাশ সাধনের দ্বারা। বাল্মীকি রচিত রামায়ণে কথিত আছে, আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতেই বারণকে বধ করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। তাইতো আজও এই দিনটিকে দশেরা বা দশহরা অথবা বিজয়াদশমী হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। দশমী কথাটির প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য সহজবোধ্য। বাঙ্গালির কাছে দুর্গারূপে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে মর্ত্যে পূজা লাভের পর দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির বিসর্জন হয় এবং লৌকিক ভাবনায় কন্যা উমা কৈলাশে পাড়ি দেন। সেই কারণেই বিজয়া দশমীতে দেবীর বিসর্জন শব্দটির সংযুক্তি। কিন্তু এই দশমীকে 'বিজয়া' বলা হয় কেন, তার পৌরাণিক ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে একাধিক কাহিনি সামনে আসে। পুরাণ মতে কথিত আছে, মহিষাসুরের সঙ্গে ৯ দিন ও ৯ রাত্রি যুদ্ধ করার পর দশমদিনে জয়লাভ করেন দেবী দুর্গা। সেই জয়কেই চিহ্নিত করে বিজয়া দশমী। মহাভারতে কথিত হয়েছে, বারো বছর অজ্ঞাতবাসের শেষে আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমীতেই পাণ্ডবরা শমীবৃক্ষে লুকিয়ে রাখা তাঁদের অস্ত্র পুনরুদ্ধার করেন এবং ছদ্মবেশ-মুক্ত হয়ে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় ঘোষণা করেন। এই ঘটনাও বিজয়া দশমীর তাৎপর্য বৃদ্ধি করে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে ছয়টি উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে পঞ্চম উৎসব এই বিজয়া দশমী। সংযোগবশত ওইদিন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত শুভশক্তির জাগরণের জন্য ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার পরমবৈভবশালী ভারত গঠনের লক্ষ্যে ১৯২৫ সালের এই বিজয়া দশমীর দিনেই নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্ঘ এই দিনটিকে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করে না, বরং অশুভশক্তির উপরে শুভশক্তির বিজয় দিবস-- বিজয়া দশমী হিসেবেই পালন করে থাকে। এই দিন ভারতীয়রা পূর্বসূরীদের বিজয়গাথা স্মরণ করে শস্ত্রপূজন করে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা ও নিজেদের প্রকৃত ইতিহাস না জানার কারণে আমরা নানা জাতি-পন্থ-মত ইত্যাদিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐক্যের সূত্র বিস্মৃত হয়ে দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়েছিলাম। পরাধীন শরীর থেকে পরাধীন মন বেশি কষ্টকর। তাই ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী পরম বৈভবশালী তথা বিজয়শালী সমাজ গঠনের জন্য চিত্তের স্বতন্ত্রতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

মা দুর্গা বাঙ্গালির ঘরের মেয়ে। আর দুর্গাপূজা বাঙ্গালিদের প্রাণের উৎসব। আসলে দুর্গাপূজা বঙ্গনারীকে অসুরদলনী দেবীদুর্গা এবং বঙ্গবীরদের নিজের নয়নপদ্ম উৎসর্গ করে তুষ্টকারী রাবণবিনাশী রামচন্দ্র হয়ে ওঠার প্রেরণা দেয়। বিজয়া দশমীতে চারদিন বাপের বাড়িতে কাটিয়ে আজ কন্যা উমার কৈলাশে ফেরার পালা। সকাল থেকেই বনেদি বাড়ি, বারোয়ারি ও ঐতিহ্যশালী মণ্ডপগুলোতে শুরু হয়ে যায় মায়েদের সিঁদুর খেলা। আর এই সিঁদুর খেলা মানে মা মহামায়ার বিদায় বেলা। দেবীকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বরণ করে নিয়ে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন মায়েরা। সকল বাঙ্গালির মনে একটাই প্রার্থনা 'আবার এসো মা আসছে বছর'। অপেক্ষা থেকে যায় বাঙ্গালিদের জন্য আরও একটা বছর। বছরকার আবাহন পর্ব শেষ। তিনদিনের পুজো শেষে বিজয়া দশমীর সকাল থেকেই বেজে যায় বিসর্জনের সুর। তারপর এক বছর ধরে চলতে থাকে সুর্দীর্ঘ প্রতীক্ষা— মা উমার আবার পিতৃগৃহে ফেরার।

দুর্গা পূজার শেষ দিন হিসেবে বিজয়া দশমী পূর্বভারতে শোকাবহ হলেও শাস্ত্রে বিষয়টিকে সেইভাবে দেখা হচ্ছে না। প্রসঙ্গত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ঘটনা স্মরণীয় এবং তার ব্যাখ্যাও তিনি খুব সরল ভাবে দিয়েছেন। একবার রানি রাসমণির জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাস আবেগবশীভূত হয়ে বিজয়ার দিনেও দেবীকে বিসর্জন দেবেন না বলে জেদ ধরে বসেন। তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সহজে বোঝান যে, বিজয়ার অর্থ দেবী-মা এবং সন্তানের বিচ্ছেদ নয়। মা কখনওই সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। ঠাকুর বলেন, 'এই কদিন বাইরের দালানে বসে মা পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে মা প্রত্যেকের হৃদয়মন্দিরে বসে পূজা নেবেন।' এই কথায় মথুরবাবুর মনের আঁধার দূরীভূত হয়। 'নিরাকারা চ সাকারা সৈব...।' অর্থাৎ যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। দেবী সাকার রূপে মর্ত্যে পূজা গ্রহণ করেছেন, তারপর নিরাকার রূপে ফিরে গিয়েছেন কৈলাশে। তার অর্থ সন্তানের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ নয়। মা-সন্তানের চিরমিলনের এই শাস্ত্রীয় তত্ত্বই প্রাঞ্জলভাবে মথুরবাবুকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

তাই বিদায়ের অশ্রু থাকলেও দেবীর বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সব আনন্দের বিসর্জন এটা ঠিক নয়! মায়ের পূজা চলতেই থাকে— অশুভশক্তির উপরে শুভশক্তির বিজয়ের প্রেরণার মধ্যদিয়ে। সেই বিজয়ের সন্দেশের প্রতীক রূপে মিষ্টি সন্দেশ বিতরণ করা হয়, বাঙ্গলায় এক বিশেষ মিষ্টিকে বোধহয় এই কারণেই সন্দেশ বলা হয়। ▯

দুর্গাপুজোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং ভাণ্ডামি

মণীন্দ্রনাথ সাহা

রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনস্থ ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন বা ইউনেস্কো গত বছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতার দুর্গাপুজোকে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটির স্বীকৃতি দেওয়ায় নিঃসন্দেহে কলকাতার দুর্গাপুজো বিশ্বের দরবারে অন্যতম সেরা উৎসবের পরিচয় বহন করছে। তবে ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি পেতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে এবং বহু সময় লেগেছে। তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন গবেষক তপতী গুহঠাকুরতা। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী অধ্যাপিকা তপতীদেবী ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত। তিনিই ২০১২ সালে দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি গ্রাহ্য হয়নি। এরপর ২০১৫ সালে দুর্গাপুজো নিয়ে তাঁর লেখা একটি বই প্রকাশের পর তপতীদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রক। এরপর ২০১৮ সালে ইউনেস্কোর কাছে জমা দেওয়ার জন্য 'ডসিয়ের' অর্থাৎ তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণাপত্র তৈরি করতে বলে কেন্দ্র। সেই গবেষণাপত্র কেন্দ্রীয় সরকার 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি'-র স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ইউনেস্কোর কাছে আবেদন করে। এরপরই কলকাতা তথা বাঙ্গলার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পায়।

সেই উপলক্ষ্যে তৃণমূল দুপুর দুটো নাগাদ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সামনে মহামিছিল বের করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। ছিলেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, কলকাতা পুরসভার মেয়র, শিল্পী ও কলাকুশলীরা। মিছিল শেষ হয় রেড রোডে। সেখানকার অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কোর দুই প্রতিনিধি, বিসিসিআই, প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেক বিশিষ্ট মানুষ। সেই মঞ্চে ইউনেস্কোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাদের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেন বেশ কয়েকটি দুর্গামূর্তি। তারপর ইউনেস্কোর দুই প্রতিনিধি এরিক ও টিমোথি বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই মিছিলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

দুর্গাপুজোকে স্বীকৃতি দানের জন্য ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতিদানের দাবিদার হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী নিজে যতই ঢাক বাজান না কেন সেটা যে তাঁর কৃতিত্বে হয়নি তা সকলেই জানেন। তবুও মুখ্যমন্ত্রী সাড়ম্বরে মিছিল করলেন কেন তা নিয়ে বিরোধী পক্ষ সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠে গেছে। সবাই জানেন ইউনেস্কোর স্বীকৃতি এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের ফলে, রাজ্যের কোনও ভূমিকা ছিল না। মমতা রাজনৈতিক স্বার্থে এই কৃতিত্ব দাবি করছেন।'

বিজেপি দলের মুখপাত্র সমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'ইউনেস্কোর স্বীকৃতির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগেই এই স্বীকৃতি এসেছে। তবে আর কেউ যদি কৃতিত্বের দাবিদার হন তিনি তপতী গুহঠাকুরতা। তিনি দীর্ঘ গবেষণা করেছিলেন দুর্গাপুজো নিয়ে। স্কুল অফিস ছুটি দিয়ে এই মিছিল হলো। মানুষের আবেগ নিয়ে রাজনীতি করা হলো আজ। ডিএ নেই, পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে, ব্যর্থ সরকার। দুর্নীতি থেকে নজর দূরে সরানোর লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী নিজে পথে নামলেন।'

পথ চলতি লোকেরা বলছেন— 'এ রাজ্যে তো স্টিকারের রমরমা। এতদিন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের স্টিকার লাগানো হতো কিন্তু কেন্দ্রের গুঁতোয় রাজ্যের স্টিকারের ওপর নতুন করে কেন্দ্রের স্টিকার লাগাতে দেখা গেছে। এও সেইরকম। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি আদায় করলেন কেন্দ্রের মাধ্যমে তপতী গুহঠাকুরতা আর রাজ্যবাসীর করের প্রায় ৩/৪ কোটি টাকা নিজের এবং দলের স্ফূর্তি করার জন্য ওড়ালেন। অথচ ভাঁড়ে মা ভবানী।

পুজো মানে তো শুধু নতুন জামাকাপড়, জুতো কেনা নয়, এই সময়ে বহু বাড়িতে মূল্যবান গৃহস্থালীর সামগ্রীও কেনা হয়। মৃৎ শিল্পীদের উপার্জন এই সময়ই বেশি। মণ্ডপ নির্মাতা, ঢাকি, পুরোহিত, ফুলচাষি, ফলচাষিদের রোজগার বাড়ে। সবমিলিয়ে পুজোর অর্থনীতি হেলাফেলার নয়। একবার অ্যাসোচেমের সমীক্ষায় পুজোয় দেড় লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতির কথা উঠে এসেছিল। বছর তিনেক আগে ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে করা সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, পুজোর অর্থনীতি বাঙ্গলার জিডিপির প্রায় আড়াই শতাংশ। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি নিয়ে গর্বিত হয়েছে বাঙ্গালি এবং এই বাঙ্গলার দুর্গাপুজো, এই কামনা করি। ◻

মা দুর্গার দশহাতে অস্ত্র দিলেন দশজন দেবতা

আশ্বিনের আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘেদের আনাগোনা। দূর দিগন্তে শরতের

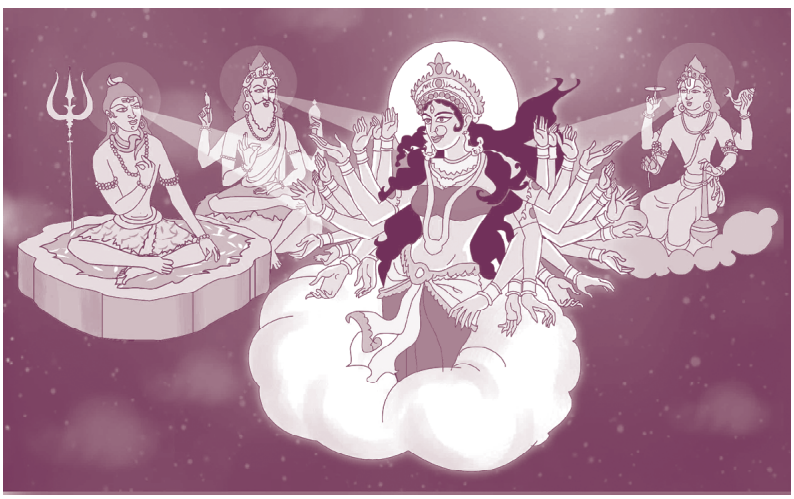

হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে কাশফুল। শিউলির গন্ধে ভরে আছে চারদিক। ফুটেছে টগর। ঘাসের শিশির বিন্দু আর ভোরের হিমেল পরশ জানান দিচ্ছে মা আসছেন। সঙ্গে লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী। সুদূর কৈলাশ থেকে মা দুর্গা আসবেন এই মর্ত্যলোকে। মহালয়ার ভোরে আবাহনী গান তারই বার্তা দিয়ে গেল। চারদিকে তাই সাজো সাজো রব। পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেল, থিম পুজোর জাঁকজমক, শহরজুড়ে বিজ্ঞাপনের ঢল, পুজোর গান, ঢ্যাং কুড়া কুড় ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচি নাচ। পটুয়াপাড়ায় মা দুর্গার প্রতিমায় শেষবেলার গোছগাছ চলছে। পৌরাণিক মতে মা দুর্গা এই সময় মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। দেবী দুর্গা কেন মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন তা তো তোমরা জানোই। এক সময় মহিষাসুর নামে এক দৈত্য অমরত্ব লাভের ইচ্ছায় কঠোর তপস্যা শুরু করল। মহিষাসুরের কঠোর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। মহিষাসুর অজেয় ও অমরত্ব লাভের বর চাইল। ব্রহ্মা মহিষাসুরকে বর দিয়ে বললেন, ত্রিভুবনে কোনও পুরুষ বা কোনও দেবতা তাকে পরাজিত করতে পারবেন না। এই বর পেয়ে দুষ্ট মহিষাসুর প্রথমেই দেবলোক আক্রমণ করল। ইন্দ্রসহ সকল দেবতা তার আসুরিক শক্তির কাছে পরাজিত হলো। দেবলোক থেকে বিতাড়িত হয়ে ইন্দ্র ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন মহিষাসুরকে উচিত শিক্ষা দিতে। তখন ব্রহ্মা,বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবাহনে আবির্ভূত হলেন এক নারী শক্তি। দেবতারা তাঁর নাম দিলেন দেবী দুর্গা। তিনি বধ করলেন দৈতরাজ মহিষাসুরকে।

দেবী দুর্গা দশভুজা। দশহাতে অস্ত্র নিয়ে তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন। দেবী দুর্গার দশহাত কেন থাকে তা কি তোমরা জানো? বলা হয় মা দুর্গার দশটি হাতের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের দুটি করে আটটি হাত থাকে। আর দুটি হাত হলো নারী শক্তির প্রতীক। মহিষাসুরকে বধ করতে দেবতারা দেবী দুর্গার দশহাতে তুলে দিয়েছিলেন দশটি অস্ত্র। এই দশটি অস্ত্রের আবার বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে পুরাণে।

জলের দেবতা বরুণ দুর্গার হাতে শঙ্খ তুলে দিয়েছিলেন। শঙ্খ হলো সৃষ্টির প্রতীক। দেবী দুর্গা সেই সৃষ্টিকে ধারণ করেন। ভগবান বিষ্ণু দিয়েছিলেন চক্র। চক্র অর্থাৎ আবর্তন। দুর্গার হাতে চক্র থাকার অর্থ তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে চলেছে গোটা বিশ্ব। দেবরাজ ইন্দ্র দিলেন বজ্র। এটি দৃঢ়তা ও ঐক্যের প্রতীক। এই দুটি গুণ থাকলেই মানুষ তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে। দেবীর হাতে পদ্ম তুলে দিয়েছিলেন ব্রহ্মা। পদ্ম হলো জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়। দেবী দুর্গাও অসুর বধ করে আলোর দিশা দেখিয়েছিলেন। দেবীর হাতের গদা বা কালদণ্ড দান করেছিলেন যমরাজ। গদা হলো ভক্তি, আনুগত্য ও ভালোবাসার প্রতীক। পার্বতীকে ত্রিশূল দান করেছিলেন স্বয়ং মহাদেব। ত্রিশূলের তিনটি ফলা মানুষের তিনটি গুণ— সত্ত্ব, তমঃ ও রজঃ'র প্রতীক। এই ত্রিশূল দিয়েই দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। পবনদেব দেন তিরধনুক। যা হলো ইতিবাচক শক্তির প্রতীক। তলোয়ার বা খড়্গ হলো তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রতীক। শেষনাগ দুর্গার হাতে তুলে দিয়েনি সর্প বা সাপ। যা চেতনার প্রতীক। এছাড়াও বিভিন্ন অস্ত্রের সঙ্গে মা দুর্গার হাতে থাকে একটি ঘণ্টা। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত এই ঘণ্টা দিয়েছিলেন। বলা হয় ঘণ্টার শব্দ আসুরিক শক্তিকে দুর্বল করে। আর মা দুর্গার বাহন সিংহ হলো শক্তির প্রতীক। যা কোনও অস্ত্রের চেয়ে কম নয়। এইভাবে দশহাতে দশটি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মা দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন।

@নিচি

ভারতের বিপ্লবী

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৮২ সালের ৩০ জুলাই মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। মেদিনীপুরে বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি ছাত্রভাণ্ডার গড়ে তোলেন। প্রকৃতপক্ষে এটি বিপ্লবীদের আখড়া ছিল। তাঁর প্রেরণায় ক্ষুদিরাম বসু বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে এখানে আশ্রয় পান। ১৯০৬ সালে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত কৃষি শিল্প প্রদর্শনীর তিনি সহ সম্পাদক ছিলেন। ক্ষুদিরাম বসু তাঁরই নির্দেশে এই মেলায় 'সোনার বাংলা' বিপ্লবী ইস্তাহার বিলি করেন। ক্ষুদিরামকে মিথ্যা অছিলায় মুক্ত করার জন্য তিনি সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। কিংসফোর্ড হত্যা ষড়যন্ত্রে ধৃত হয়ে মেদিনীপুর জেলে বন্দি থাকেন। জেলের মধ্যে নরেন গোঁসাই হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় ১৯০৮ সালের ২৩ নভেম্বর ফাঁসি হয়।

জানো কি?

- মা দুর্গার মুখমণ্ডল ভগবান শিবের তেজদীপ্তি থেকে সৃষ্টি হয়েছে।
- চণ্ড ও মুণ্ড নামের দুই অসুরকে মা দুর্গা অষ্টমী-নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে বধ করেছিলেন।
- গিরিরাজ হিমালয় মা দুর্গাকে সিংহ উপহার দিয়েছেন।
- কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা মায়ের কাঠামোতে প্রলেপ দেবার জন্য অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গঙ্গা থেকে তুলে আনেন।
- বিসর্জনের সময় মর্ত্যধাম থেকে মা দুর্গার কৈলাশে প্রত্যাবর্তনের বার্তা নীকণ্ঠপাখির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

ভালো কথা

শিক্ষক দিবস

শিক্ষক দিবসের দিন আমরা আমাদের স্কুলে শিক্ষক পূজা হলো। আমাদের পাড়ার বড়োরাও হেডস্যারকে পূজা করলেন। আমার মা-ও করেছেন। বাবা বললেন, বর্তমান হেডস্যার তাঁদেরও শিক্ষক। হেডস্যার-সহ আর চারজন শিক্ষক মহাশয়কে আমরা পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করে প্রণাম করেছি। সারা গ্রামে চার-পাঁচশো মানুষ এসেছিল। এক ঘণ্টা ধরে এইসব হচ্ছিল। পাড়ার সবাই চলে যাবার পর হেডস্যার ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের গল্প বললেন। অন্যান্য সারেরাও গল্প বলেছেন। ছুটির সময় হেডস্যার বাড়ি গিয়ে নিজের নিজের মা-বাবা ও গুরুজনদের প্রণাম করতে বলেছেন। কারণ বাবা-মা-ই মানুষের প্রথম শিক্ষক। বাবা রাত্রিবেলা হেডস্যারকে বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন।

সমীরণ রায়

চতুর্থ শ্রেণী, মেঘুটোলা, মোথাবাড়ি, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ষ ন মা ব	(১) ন প কা ত্রি ব
(২) য় র ভ ণ	(২) উ ন তু ব ন

২২ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) অকালমৃত্যু (২) অত্যাধুনিক

২২ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) অকালবোধন (২) অন্দরমহল

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভজিৎ দাঁ, টিপি রোড, কলকাতা-৬ (২) সার্থক সাহা,বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগনা। (৩) শ্রেষ্ঠা দত্ত, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর। (৪) বৃষ্টি মাহিন্তা, ১নং গভঃ কলোনি, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

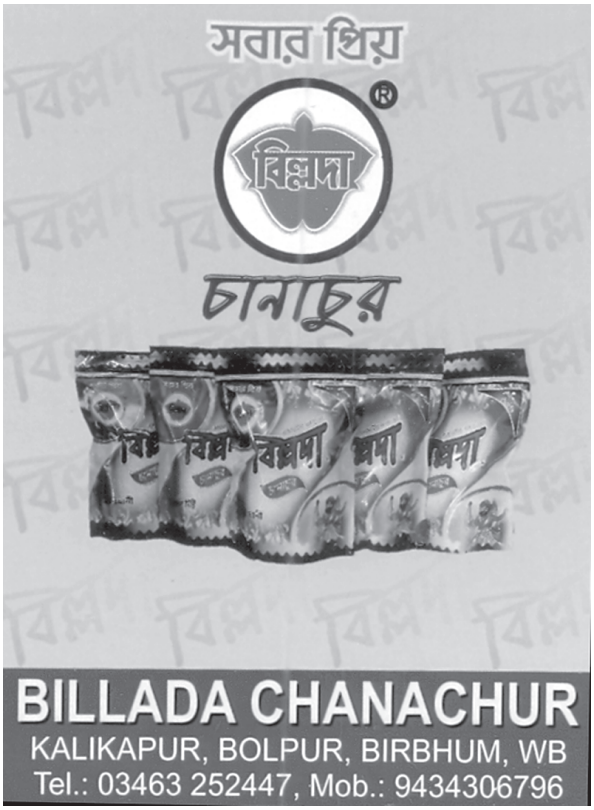

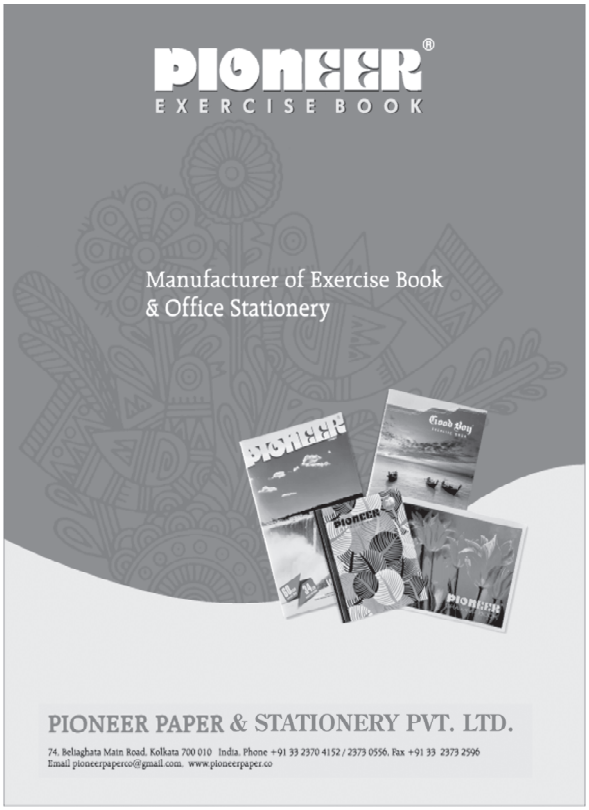

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

জনজাতি সমাজেও দুর্গাপূজা আনন্দের বার্তা বয়ে আনে

উত্তম মাহাতো

বাঙ্গলার বারো মাসে তেরো পার্বণ প্রচলিত কথা— কান পাতলেই শোনা যায় মা-দুর্গার আগমনী বার্তা। বাঙ্গলার মাঠ-ঘাটে কাশফুলের বন প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলে। মণ্ডপে মণ্ডপে মায়ের মূর্তি তৈরির জন্য খড়, মাটি, বাঁশ আনা শুরু হয়ে যায়। জনজাতি এলাকায় সন্ধ্যার পর মাদল, ধামসার আওয়াজে নিশ্চিত হয়ে যায় মায়ের আগমন। জনজাতি সমাজে মায়ের আগমনের প্রস্তুতি হিসেবে দাশাই নাচ ও গানের মহড়া শুরু হয়ে যায়। 'দেবী রে পিটা কালী রে লাড্ডু'— জনজাতি মায়েদের মুখে মুখে এই গান শোনা যায়। পরম্পরাগত পোশাকে নাচের অভ্যাস— দাশাই নাচ ও গান দুর্গাপূজা পেরিয়ে গেলে আর কেউ করবে না— এতটাই তারা পালন করে। যে সব জায়গায় জনজাতি সমাজ নিজের বাড়িতে দুর্গাপূজা করে, পূজার সময়ে যে বেলবরণের সময় সমস্ত বাড়িতে গেরু রং দিয়ে ঘর সাজানো অর্থাৎ মা-কে বরণ করার জন্য আয়োজন করা হয়। এছাড়াও পাট দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র 'ভুয়াং'-এর তালেই দাশাই নাচ হয়। আজও সব জায়গায় জনজাতি বাড়িতে দুর্গাপূজা দেখতে পাওয়া যাবে। বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার সুলুঙ্গা গ্রামে, পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থানার কমুড্ডি গ্রামে ভূমিজ জনজাতি দ্বারা এখনও পূজা হয়। পুরুলিয়া থেকে বলরামপুর যাওয়ার পথে ছোটো উরমাতে মায়ের পুজো সাঁওতাল জনজাতির মধ্যে হয়। তেমনি বাগমুণ্ডির বহু পুরনো ঐতিহ্যবাহী পূজা ভূমিজ জনজাতি সিংদেওদের বাড়িতে হয়। অযোধ্যা পাহাড়ে ভূমিজ জনজাতিদের মধ্যেও খুব ধুমধাম করে পুজো হয়ে থাকে।

বাগমুণ্ডির কালিমাটির কাছে কুচিগ্রামে পুজো উল্লেখ করার মতো। মানবাজারে বান্দোয়ান থানা এলাকার আগইবিল গ্রামে, কেন্দা থানার পৈড়া গ্রামে, আড়াষার পলপল, বাতিকরা, বদড়া রাঙ্গামাটি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বটতলিতে ভূমিজ জনজাতিদের মধ্যেও মা দুর্গার পুজা হয়। বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ থানার তালগোড়াগ্রামে ভূমিজ জনজাতিরা দুর্গাপূজা করেন। এসময় জনজাতি সমাজে ও দুর্গাপূজার এক আত্মিক যোগ আমরা দেখতে পাই। পূজার সময় জনজাতি সমাজও আনন্দে মেতে ওঠে।

(লেখক কল্যাণ আশ্রমের প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক)

প্রবাসের পুজোয় আন্তরিকতার অভাব নেই

তানিয়া বেরা

২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে বিবাহসূত্রে পাড়ি দিলাম জার্মানি। পশ্চিম ইউরোপের সাজানো গোছানো দেশ, যাদের নিয়মানুবর্তিতা ও ভাষাপ্রেম শিক্ষণীয়। ঝকঝকে রাস্তাঘাট, কম জনসংখ্যা ও সময় মেনে চলা যানবাহন যাদের বৈশিষ্ট্য বলা যায়। এহেন দেশে খাওয়া ও থাকার জন্য আমাকেও আয়ত্ত করতে হয়েছে জার্মান ভাষা। এখন আমার ঝুলিতে যোগ হয়েছে জার্মান ভাষার সার্টিফিকেট। নিজের দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে সবই শিখতে হয়েছে। ভালোমন্দ মিশিয়ে। কিন্তু বাঙ্গালি কোথাও গিয়ে আটকে যায় দুর্গাপুজো এলে। জার্মানিতে এখন মেঘের ভেলা, ঠিক যেন বাঙ্গলার শরৎকাল। দেখতে দেখতে চলে এলো সেই প্রাণের উৎসব এবং শেষে মন খারাপের পালা। যদিও আজকাল মুঠোফোন ও প্রযুক্তির কল্যাণে সবকিছুই সহজলভ্য। গত বছর মোবাইলে তাই বাবা-মা, আত্মীয়-বন্ধু সবাই দেখালো

বাঙ্গলার মা-দুর্গার পুজো। এখন অবশ্য প্রবাসে দুর্গাপুজো বেশ বিখ্যাত। আমরাও তাই খুঁজে পেতে বেরিয়ে পড়ি পুজো দেখতে। আমি থাকি হাইডেলবার্গ শহরে।

দেখা গেল সেখান থেকে দু-ঘণ্টা পথ ট্রেনে পাড়ি দিয়ে যেতে হবে স্টুটগার্ট শহরে, তারপর মেট্রো করে আরও কুড়ি মিনিট সব মিলিয়ে আড়াই ঘণ্টা পথ পেরিয়ে দেখা পেলাম আমাদের সবার প্রিয় মা-দুর্গা সঙ্গে তাঁর চার ছেলে-মেয়ের। সেই আনন্দ লিখে প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার নেই। গাঙ্গুলী পরিবার সেখানকার অনেক বছরের বাসিন্দা। স্বামী-স্ত্রী, সঙ্গে ছেলে-বউমা নিয়ে তাদের নিজেদের ছোটো জগৎ। আর

এই পুজো তারা প্রচলন করেন আর পাঁচটি বাঙ্গালির কথা ভেবে যারা পুজোতে বাড়ি ফিরতে পারে না। ১৯৯৫ সালে তুষারকান্তি গাঙ্গুলী এই পুজো শুরু করেন স্টুটগার্ট শহরে। কলকাতা থেকে মা দুর্গা পাড়ি দিয়ে সুদূর জার্মানি আসেন। তারপর থেকে নিয়ম নির্ঘণ্ট মেনে পুজো হয়ে আসছে একদম ঘরোয়া পরিবেশে। বাঙ্গলার পুরোহিতরা সেখানে গিয়ে পুজো করেন। শুধুমাত্র জার্মানির বাঙ্গালিরা নয়, পুজো দেখতে সেখানে পাশের দেশ পোল্যান্ড, ফ্রান্স থেকেও বাঙ্গালিরা আসেন। এটি গুগল ম্যাপে পাওয়া প্রথম প্রবাসে দুর্গাপুজো। এখন পুজোর দায়িত্ব সামলান তিমিরকান্তি গাঙ্গুলী। আর যার কথা না বললেই নয় তিনি শ্রীমতী রীতা গাঙ্গুলী, যার নির্দেশনায় সুষ্ঠুভাবে সবকিছু পালিত হয়। তাদের সাহায্য করেন স্থানীয় বাঙ্গালিরা। আরও অনেক বাঙ্গালি সেখানে আসেন এই আনন্দ ভাগ করে নিতে। পুজো, আরতি, তারপর প্রসাদ গ্রহণ, সবার সঙ্গে গল্প করা সবই হয় মন ভরে। ভালোই কাটে দুর্গাপুজোর অষ্টমী। এই পরিবারের সকল সদস্য খুবই আন্তরিক। তাদের অতিথি আপ্যায়ন সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রবাসের দুর্গাপুজোতে বাঙ্গলার মতো আড়ম্বর নেই। কিন্তু আন্তরিকতা অবশ্যই আছে। বাঙ্গালিরা তাদের মতো করে পরিবেশ ঠিক বানিয়ে নিয়েছে, মন খারাপ দূর করার জন্য। নিজের দেশ থেকে দূরে থেকেও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। জার্মানিতে আরও অনেক বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন আছে যারা বড়ো করে দুর্গাপূজা করে।

(লেখক কর্মসূত্রে জার্মানির হাইডেলবার্গের বাসিন্দা)

টেমসের ধারে কাশফুল আর চাঁদের আলোয় মায়ের বোধন

সারদা সরকার

শরৎকালের মেঘ এখন লন্ডনের আকাশ জুড়ে, প্যাম্পাস গ্রাস মানে এক ধরনের কাশফুল মাথা তুলছে মাঠে ঘাটে। রোগমুক্তির পর এই প্রথম এবারের লন্ডনের পুজো। তাই আনন্দময়ীর আগমনের সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের টেমসনগরীও আনন্দে ডগমগ।

এবারেও অনেক পুজো হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি পুজোর থিমই ভারতের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব। তার সঙ্গে এখন জুড়ে গিয়েছে ইংল্যান্ডের রানিমার জীবনাবসান এবং তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। রানিমাকে এই দেশের মানুষ ভালোবাসে। তাই প্রবাসী বাঙ্গালির মনেও এক বিশেষ স্থান রয়েছে মহারানি এলিজাবেথের জন্য। বিলেতের পুজোর সময় বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ পূজার আনন্দে মিশে থাকবেন রানিমা ও তাঁর জীবনকাহিনি।

ছোট্ট জনপদ মিচ্যাম, তবে বাঙ্গালির সংখ্যা কিন্তু কম নয়। উৎসাহের কিছু কমতি নেই। শহর লন্ডনের উপকণ্ঠে সবুজে সবুজে ঘেরা এই ইংলিশ টাউনেই আমাদের পুজো— সাউথ লন্ডন দুর্গাপুজো। দিনের শেষে একবার মায়ের পায়ে ফুল না দিলে মনে হয় পুজো হলো না। কলকাতার পূজা এসে হাজির এমন এক হলঘরে যেখানে সাহিত্য, কবিতা, খাওয়াদাওয়া, গানবাজনায় বাঙ্গালির সংস্কৃতি হাত ধরবে পরের প্রজন্মের। যারা হয়তো সেরকম ভাবে কলকাতার পুজোর সঙ্গে পরিচিতই নয়। তবু এ যেন তাদের নিজের পুজো। চিরবহমান সংস্কৃতি যুগোপযোগী হয়ে বদলে গিয়েও বদলায়নি। কারণ বাঙ্গলা আর বাঙ্গালিকে না ভালোবেসে প্রবাসীর আর উপায় কী?

চেনা দৃশ্য, চেনা মুখ, চেনা কথকতা, টিপটিপ বৃষ্টি। তবু নতুন করে জাগবে আবার লন্ডনের পুজো। কচিকাঁচারা ইলাস্টিকের ধুতি, শাড়ি পরে তিরতির করে দৌড়োবে পুজোবাড়ির এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। মাইকে বাজতে থাকবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের চণ্ডীপাঠ! বাঙ্গালি যতদিন থাকবে ততদিন থাকবেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। দেশ বিদেশ সর্বত্র। সিঁদুররাঙা মেঘ দূরে উড়ে যাবে বঙ্গোপসাগরের তীরে আমাদের জন্মভূমির দিকে। মেঘপিওনের ব্যাগে একটুকরো চিঠিতে লেখা রয়েছে বাঙ্গালির মনের বার্তা— ভালো থেকো সকলে। সর্বে হপি সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ— আমার বাঙ্গলা নীরোগ হোক, সুখী হোক, শান্তি আসুক আনন্দময়ীর আগমনে।

দেখতে দেখতে কেটে যাবে পুজো বাসর। লালপেড়ে সিল্কের শাড়ি পরবে বাঙ্গলার বধূরা। রাজরানির মতো লাগবে সকলকে। তাদের ঘিরে সকলের মুগ্ধতা শুক্লা সপ্তমীর চাঁদের মতোই উজ্জল হয়ে উঠবে। মহিলামহল মত্ত থাকুক ফেসবুক থেকে জারদৌসি, হীরে থেকে জিরের আলোচনায়। আমি এগিয়ে যাবো মানুষের ভিড়ে। পুজোহলের চারপাশে রিয়েল এস্টেটের স্টল, পিঠেপুলি, এগরোল, চাউমিন, শাড়ি, গয়না, বই, ট্যাবলয়েড, কীভাবে দেশে টাকা পাঠানো যায় এসবের আড়ালে হঠাৎ নজর পড়বে গড়িয়াহাটের, বালিগঞ্জ অথবা মহম্মদ আলি পার্কের একটুকরো রাস্তাঘাট। ফেসবুকের স্ক্রিনে। প্রবাসীরা নজর রাখব বাগবাজার সর্বজনীন বা একডালিয়ার পুজোর দিকে। আনন্দযজ্ঞে হাজির হয়েছে ইংল্যান্ডের এই শান্তিনিকেতনটিও। অঞ্জলির মন্ত্রে— মাকে মনে পড়ে যাবে! ফুলের সাজিতে হাত ছুঁয়ে ধরতে চেষ্টা করি জননী জন্মভূমিকে! সন্ধিপুজো, কুমারী পুজো সব হয় একে একে নিখুঁত ভাবে, নিয়ম মেনে! হিয়া টুপটাপ জিয়া-নস্টাল আমরা প্রথম প্রজন্মের বাঙ্গালিরা বেখেয়ালি বর্ষা, প্যান্ডেলের এলোমেলো বাঁশ, মহালয়ার গান, ধুনুচির আলো, টিমটিমে প্রদীপ সাজিয়ে বসে থাকি— আকাশ জুড়ে ভাসে তুলোমেঘ! পুজো আসে, পুজো যায়! একদিকে রবীন পাল দুগ্গার চোখে আলো দেয় লম্ফের আলোতে। অন্যদিকে আমাদের মায়েদের চোখের আলো কমতে থাকে— আমি শিউলি ফুল খুঁজে বেড়াই একা একা, একদম একা! তবু এ শহরই জানে আমার— আমাদের সব কিছুই! সিঁদুরখেলার বরণডালা ছুঁয়ে যায় সবাইকে। সিঁদুর মাখাই আমি সখীদের। একে অন্যকে এভাবে একটু করে প্রাণ মিশিয়ে বরণ করে নিই বাংলা সংস্কৃতিকে। সবাই একে একে বলে যায় শুভ বিজয়া। নানা ভাবে নিজেরা নিজেদের মতো করে ভেসে যাই, টেমসের জোয়ারে গঙ্গাও মিশে যায়। দক্ষিণ লন্ডনের মিচ্যামের আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঁকি দেয় ঝাঁক ঝাঁক কাশফুলের আড়ালে। হিমের পরশ এখন লেগেছে হাওয়ায়— পুজো শেষ মানেই ঝুপ করে শীত এসে যাবার ভয়ে চাঁদও বুঝি চাদর খোঁজে— মেঘের চাদরে ঢেকে যায় শীতকাতুরে নবমী নিশি। আগামী কাল বিজয়া— আমরা মা কে বিদায় দেব সিঁদুরে আলতায় দর্পণে— পুনরাগমনায় চ! তবে সঙ্গে করে ব্যাধি আর এনো না মা— আমাদের দিও শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।

(লেখক লন্ডনের স্কুল শিক্ষক)

পুজোর দুটোদিন আমরা দেশ থেকে বহু দূরে থাকার দুঃখ ভুলে যাই

হৈমন্তী ব্যানার্জি

বছরটা ছিল ১৯৯৩। সে বছর আমার দেখা প্রথম দুর্গাপুজো বোস্টনে। ক্যালেন্ডারে তারিখটা বার করতে কয়েক সেকেন্ড মাত্র লাগল গুগলেশ্বরের দয়ায়। পুজোর দিনটা ছিল ২১ অক্টোবর, সেদিন ছিল সপ্তমী। আমরা ২০ অক্টোবর অফিস থেকে ফিরে পুজো মণ্ডপে যাব, আমার স্বামী বললেন। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছি সেই দিনটার জন্য। মনের মধ্যে তো চাপা ঝড় চলছিলই। দেশে বাবা-মা, দিদি ও বোনকে ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে পুজো কাটানো এই প্রথমবার একটা আবেগমিশ্রিত ব্যাপার সেটা ঠিক বলে প্রকাশ করা যাবে না।

আমি, আমার স্বামী ও আমার দেওর তৈরি হলাম। নতুন শাড়ি সুটকেসে যেগুলো এসেছিল আমার সঙ্গে ১৯৯২ সেপ্টেম্বর, তারই মধ্যে একটা বেছে নিয়ে পরলাম। আমরা তিনজনে গাড়িতে বসে রওনা দিলাম ওয়াটারটাউনে। আমাদের বোস্টন বিকন হিল থেকে ৩০ মিনিট মতো লাগল। গাড়ি দাঁড়াল একটা চার্চের সামনে, চার্চের নাম St. Methodist Church, Watertown। আমি তো অবাক হয়ে গাড়ি থেকে নামলাম।

চার্চের ভিতর যেতেই সকলে সামনে আসতে লাগলেন ও নিজেদের পরিচয় দিয়ে আমাকে পুজোর জায়গায় নিয়ে গেলেন। আমার যেন সবাইকে আপন মনে হলো। মনে হলো যেন তাঁদের সকলকেই আগে থেকে চিনি। তাদের মধ্যে লিপিদি নিশীথদা, মিঠুদি, বিনয়দা, রনেনদা, রূপাদি— আরও অনেকেই। সকলের নামতে বলা হলো না কিন্তু প্রত্যেকের আন্তরিকতা ও কাছে টেনে নেওয়া আমাকে বেশ আবেগাপ্লুত করেছিল।

ওই চার্চে সপরিবারে মা দুর্গার একচালার মূর্তি বেসমেন্টে রাখা থাকত। প্রত্যেক বছর সেই মূর্তি বার করে সুন্দর করে সাজানো হতো মেন হলে। শুক্রবার থাকত শুধু প্রতিমাকে সাজানো গোছানোর জন্যে। এবং পরের দিনের খাবারের ব্যবস্থা ও পুজোর জোগাড় চলত অনেক রাত পর্যন্ত। রবিবার দুপুর থেকে বিদায়ের সুর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলত। মহিলাদের একসঙ্গে হওয়া, তাদের হাসি, গল্প ও খাওয়াদাওয়ায় চার্চের পরিবেশ দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে পরিণত হতো।

পনেরো বছর ধরে ওই চার্চেই দুর্গাপুজো করা হয়েছিল। পরেরদিন বেশ সকালে পুজোমণ্ডপে তারই প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু মনের মধ্যে বড়োই একটা উদাসীনতা ও কষ্ট অনুভব করছিলাম। বিশেষ করে বাবা-মায়ের কথা খুব মনে হচ্ছিল ও চোখে জল ভরে আসছিল। ভাবছিলাম যদি আজ একটা চিঠি পেতাম তাঁদের তাহলে কতই না ভালো হতো। আমরা তৈরি হয়ে তিনতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। নীচের তলায় এসে একটা আলতো করে অতি সংকোচে mailbox-টা খুলতেই দেখলাম একটা নীল রঙের aerogram। উপরে বাবার সুন্দর, স্বচ্ছ হাতের লেখায় আমাদের ঠিকানা। আমার চোখের জল ও আনন্দ একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। মা দুর্গার কাছে এক কোণে বসে চিঠিটা পড়তে পড়তে হারিয়ে গেলাম সেই ধানবাদে। কত স্মৃতি, পুজোর কথা, একে একে মনে পড়ছিল। পরে সংবিৎ ফিরল প্রসাদ নেবার ডাকে। স্মৃতি সব জীবন্ত হয়ে উঠলেও এখানকার হাসি, কলরব ও আড্ডায় কিছুটা চাপাও পড়ে গেল। অনেক নামকরা সব artist-দের আগমন— সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখার্জি, সবিতা রায়চৌধুরী সেই সময়ের সকলকেই কাছে পাওয়া ও তাদের নাটক ও গান শুনে আমাদের সুন্দর সন্ধ্যা কেটেছে। বোস্টন প্রবাসী বাঙ্গালিদের এই দুটো দিনের পুজোর আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের নাম কিছুতেই না নিয়ে পারছি না। তাঁরা বিনয় পাল, বিজ্ঞান চক্রবর্তী ও দিলীপ পাল। তাঁদের যৌথ ও অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় বাঙ্গলা ও বিশ্ব ক্লাবের গঠন হয় ও প্রতিবছর এই পুজো হয়ে আসছে সেই থেকে। বাঙ্গলা ও বিশ্ব আমাদের প্রবাসী বাঙ্গালিদের দেশ ছাড়ার

দুঃখ ভোলায় দুর্গাপুজোর মধ্যে দিয়ে।

তারপর পুজো চার্চ থেকে সরে Littleton High School-এ হতে শুরু করল বছর দশেক হলো। লোকজনের সংখ্যা অনেক বাড়াতে হাইস্কুলে বেশ হইহই করে পুজো হয়। বর্তমানে হাইস্কুলের বিশাল রান্নাঘরে দুদিন ধরে অনেক রকমের রান্নাবান্না হয় পালা করে। ছোটো ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলা ও পুজোর আনন্দ সব মিলিয়ে ওদের কাছে এক বাঁধভাঙা আনন্দ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শনিবার ও রবিবার— দেশের ও স্থানীয় আর্টিস্টদের সমাবেশে এক বিশেষ সন্ধ্যা আমরা কাছে পাই।

আমার ছেলে-মেয়েরাও অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পুজোয় আনন্দ করে। অঞ্জলি দিতে দিতে কবেই যেন বড়ো হয়ে গেল। তারা অপেক্ষায় থাকত এই দুটো দিনে তাদের বাঙ্গালি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে।

বোস্টনে কয়েকটা বাঙ্গালি ক্লাব আছে। সব ক্লাবই চেষ্টা করে বিভিন্ন উইকএন্ডে পুজোর ব্যবস্থা করার যাতে যেন অন্য ক্লাবের সদস্যরা যোগ দিতে পারে কিন্তু সেটা প্রত্যেক বছর সম্ভব হয় না। মা নানান ফুলে সুসজ্জিত হয়ে অপূর্ব সাজে সেজে থাকেন। শিউলি, পদ্মের অভাব পূরণ না হলেও মা কিন্তু এখানকার নানান ফুলে অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছেন।

পুজোর শেষ হয় সিঁদুর খেলা দিয়ে। মাইকে বাজে ঢাকের বোল, বাজে কাসর, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নাচ পুজোর শেষ রেশটাকে ধরে রাখে। তারপর মা ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের এবছরের মতো বাক্সবন্দি করা হয়।

মা আমাদের দুঃখ, শোক বাক্সবন্দি করে হাসি ও আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে সে বছরের মতো বিদায় নেন বোস্টনের বুক থেকে।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি— মাগো ভালো থেকো, সবার মঙ্গল করো।

(লেখক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বোস্টনের বাসিন্দা)

দুর্গা : এক পরিপূর্ণ রাষ্ট্র ভাবনা

সূর্য শেখর হালদার

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী/কমলা কমল দল বিহারিনী/বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং'। এভাবেই বন্দেমাতরম্ গানের মধ্যে দেবী দুর্গা তথা দেশমাতৃকার স্তব করেছেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন এই গান, আর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে আনন্দমঠ উপন্যাসে যুক্ত করেন এই সংগীতটিকে। এটি ভারতের জাতীয় স্তোত্র। কারণ এটি হলো দুর্গামাতা রূপে রাষ্ট্রের বন্দনা যা সনাতন ভারতের ঐতিহ্য। এখানে আনন্দমঠের যে সন্ন্যাসীরা গানটি গেয়েছেন, তাঁদের কাছে মাতা হলো দেশমাতা, আর দেশমাতা হলো দেবী দুর্গা স্বয়ং।

দেশমাতা রূপে দেবী দুর্গাকে পরিবেশন বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম করেননি। আমরা রামায়ণে প্রথম শ্রীরামকে বলতে শুনি : 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। অর্থাৎ স্বর্গের চেয়েও গরিমা যুক্ত হলেন দেশ ও মাতা। এর অর্থ দেশমাতা ঈশ্বর সমতুল্য পূজনীয়। ভারতের ইতিহাস দেখলে আমরা দেখব বহিরাগত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় দেশমাতাকে দুর্গা রূপে কল্পনা করেছেন ভারতের বহু জনগোষ্ঠী বা রাজা-মহারাজা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রাজপুত ও মারাঠাদের বহিরাগত মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়াইতে তাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করতেন 'জয় ভবানী' ধ্বনি তুলে। ভবানী দেবী দুর্গার আরেক নাম। এর অর্থ এই যে দেশমাতাকে রক্ষা করার জন্য যে যুদ্ধ, সেখানে ভারতীয় সেনারা স্মরণ নিতেন দেবী দুর্গার।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশমাতাকে দুর্গারূপে পূজা করাকে জনপ্রিয় করেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। পরবর্তীতে আমরা দেখি স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দেবী দুর্গার উপাসনা করছেন। এর কারণ হলো সনাতন ভারতের সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রকে মাতৃশক্তি বা দেবী দুর্গা রূপে কল্পনা করা। পরম বৈভব সম্পন্ন রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বীরব্রত, আর দেবী দুর্গার আরাধনা ব্যতীত এই বীরব্রত লাভ করা সম্ভব নয়। তাই বারবার দেবী দুর্গার মধ্যেই পরিপূর্ণ রাষ্ট্রভাবনাকে প্রতিফলিত করেছে ভারতবর্ষের মানুষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় রাষ্ট্রমাতা দেবী দুর্গা হলেন দশপ্রহরধারিণী, অর্থাৎ দশ হাতে অস্ত্র ধারিণী : তিনিই দেবী লক্ষ্মী বা কমলা এবং তিনিই বাণী, বিদ্যাদায়িনী অর্থাৎ দেবী সরস্বতী। অর্থাৎ দেশমাতা হলেন শক্তি, সম্পদ ও জ্ঞানের উৎস। দেশ রক্ষা করতে যেমন শস্ত্রের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সম্পদ এবং শাস্ত্র জ্ঞানের। আনন্দমঠ উপন্যাসে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ ঠাকুর মহেন্দ্রকে দেবী দুর্গার তিনটি রূপ দর্শন করান। এই তিনটি রূপ ভারতবর্ষের রূপ। তা হলো— 'মা যাহা ছিলেন, মা যাহা হইয়াছেন, মা যাহা

হইবেন।' অর্থাৎ দেশমাতৃকার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। এই তিনটি রূপ হলো যথাক্রমে মা জগদ্ধাত্রী, মা কালী এবং মা দুর্গা। অতীতে জন্মভূমি দেশমাতৃকা ছিলেন সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ। তাই অতীতের ভারতমাতা দেবী জগদ্ধাত্রী। বর্তমানে অর্থাৎ ঋষি বঙ্কিমের সময়ে (উনিশ শতক) দেশমাতা পরাধীন, নগ্নিকা, রুধিরসিক্তা, কঙ্কালমালিনী মা কালী। আর ভবিষ্যতে তিনি হতে যাচ্ছেন দশ হাতে অস্ত্র সমন্বিত দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা। এভাবেই রাষ্ট্রের অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের বর্ণনা দিতে গিয়ে দেবী দুর্গার তিনটি রূপের সাহায্য নেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

আবার দেবী দুর্গা সত্ত্বগুণের প্রতীক, আর তাঁর বাহন হলো বনের রাজা সিংহ। পুরাণ অনুযায়ী এই সিংহ দেবীকে প্রদান করেন হিমালয়। সিংহ রজোগুণের প্রতীক। দেশ পরিচালনার জন্য সত্ত্ব ও রজোগুণের সমন্বয়ের প্রয়োজন অবশ্য। তাই আমরা দেখি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পি.এস. রামচন্দ্র রাও ভারতমাতার যে ছবি অঙ্কন করেন, সেখানে দেশমাতা দেবী দুর্গার মতো সিংহবাহিনী। এই সিংহবাহিনী রাষ্ট্রমাতার প্রতিমা সত্ত্ব ও রজোগুণের সমন্বয়ের প্রতীক। এর আগে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ভারতমাতার ছবি ছিল জাতীয়তাবাদীদের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক। অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য রাষ্ট্রমাতাকে বৈষ্ণবী রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল অন্ন, বস্ত্র, রুদ্রাক্ষ যা জ্ঞানের প্রতীক এবং বরাভয়। রাষ্ট্রমাতা আমাদের অন্ন, বস্ত্র, জ্ঞান দিয়ে প্রতিপালন করেন ঠিক যেমন ঈশ্বরী করে থাকেন। এটিও মাতৃশক্তির একটি রূপ। তবে মাতৃশক্তি সন্তানকে সুরক্ষাও দান করেন। এই সুরক্ষার দিকটি আরও প্রাণময় হয়ে ওঠে পি.এস. রামচন্দ্র রাওয়ের সিংহবাহিনী ভারতমাতার ছবিতে। আজও প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি সিংহবাহিনী ভারতমাতার প্রতিমা দেশজুড়ে পূজিত হয়।

বঙ্গিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ছাড়াও ঋষি অরবিন্দের সাবিত্রী কাব্যগ্রন্থে আমরা দেশমাতা রূপে দেবী দুর্গার কল্পনার অস্তিত্ব পেয়ে থাকি। সাবিত্রী কাব্যগ্রন্থের সাবিত্রী হলেন দেশমাতা দেবী দুর্গা। পণ্ডিচেরিতে যে বিগ্রহের সম্মুখে ঋষি অরবিন্দ ধ্যানমগ্ন হতেন, সেটাও ছিল

অখণ্ড ভারতের মানচিত্র আর ভারতমাতার চিত্রপট। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বেলুড়মঠে শক্তি পূজা আরম্ভ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিও তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবন্ধে জাতির উন্নতির জন্য আদ্যাশক্তি রূপে দেশমাতাকে পূজার কথা বলেছিলেন। তাই তাঁর দুর্গাপূজা যে আসলে ভারতমাতার পূজা— এই কথা সর্বজন স্বীকৃত।

বর্তমানে আমরা যে দুর্গা প্রতিমার আরাধনা করি, সেই দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে থাকেন দেবী সরস্বতী, দেবী লক্ষ্মী, দেবসেনাপতি কার্তিক ও শ্রীশ্রী গণপতি। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এঁরা হলেন দেবী দুর্গার সন্তানাদি। তবে এইরূপ ধারণা নেহাতই লৌকিক ধারণা। কিন্তু লৌকিক ধারণা হলেও এই উপাসনার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গার উপাসনাকে আমরা এক পরিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার বন্দনাতে পরিণত করেছি। দেবী সরস্বতী বিদ্যা, জ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতীক : দেবী লক্ষ্মী সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রতীক : দেবসেনাপতি কার্তিক প্রতিরক্ষা বা সুরক্ষা এবং শ্রীশ্রী গণপতি জনশক্তির প্রতীক। এখন রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য শিক্ষা-সংস্কৃতি, সম্পদ, প্রতিরক্ষা এবং জনশক্তি চারটি বিষয়েরই প্রয়োজন। প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজে ছিল চারটি বর্ণ যা শরীরের চার অঙ্গের মতো অপরিহার্য। বর্ণপ্রথা মানে উচ্চ-নীচ বিচার নয়। এইরূপ ধারণা মেকলে শিক্ষা ব্যবস্থার আবিষ্কার। বৈদিক সমাজে চার বর্ণ ছিল একে অপরের পরিপূরক। রাষ্ট্রমাতা দেবী দুর্গাও ঠিক তেমনই এই চার বর্ণের উপর নির্ভরশীল। তাই দেবী সরস্বতী, দেবী লক্ষ্মী, শ্রীশ্রী কার্তিক, ও শ্রীশ্রী গণেশ ছাড়া দেবী দুর্গার পূজা সম্ভব নয়। আমরা ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখব এই চারজন দেব-দেবী চার বর্ণের প্রতীক। জ্ঞান বিদ্যার দেবী সরস্বতী প্রথম বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গুণের প্রতীক : শ্রীশ্রী কার্তিক হলে ক্ষত্রিয় গুণের প্রতীক : সম্পদের দেবী লক্ষ্মী হলেন বৈশ্যগুণের প্রতীক আর শ্রীশ্রীগণপতি হলেন শূদ্র গুণের প্রতীক। ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্যের সম্পদ আর শূদ্রের শ্রম একত্রিত হলে, তবেই কিন্তু রাষ্ট্রমাতা বৈভব সম্পন্ন হতে পারে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে দেবী দুর্গা ও তাঁর পরিবার একত্রে হয়ে ওঠেন সম্পূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতীক। রাষ্ট্রের কাজ হলো দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। মহিষাসুর রূপী দুষ্টের দমন করে দশপ্রহরণধারিণী রাষ্ট্রমাতা সেটাই করে চলেছেন।

আবার দুর্গা সম্পর্কে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে দেবী 'নিঃশেষ দেবগণ শক্তিসমূহ মূর্ত্যা'। তাঁর দশ হাতের অস্ত্র দেবতাদের সম্মিলিত শস্ত্র। দেশমাতা বা ভারতমাতার শক্তিও ঠিক তেমনই নাগরিকদের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ। রাষ্ট্র যেমন সমসংস্কৃতি ও সমভাবাপন্ন মানুষদের সম্মিলিত শক্তি, ঠিক তেমন দেবীদুর্গা হলেন সংগঠিত দেবগণের সম্মিলিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ। তাই যথার্থই দেবী দুর্গা হলেন রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপূর্ণ রূপ। দেবী দুর্গার আরাধনার অর্থ রাষ্ট্রেরই আরাধনা : আর দুর্গা প্রতিমা ভাঙার অর্থ হলো রাষ্ট্রকে আক্রমণ। দেবী দুর্গাকে অপমান হলো দেশদ্রোহিতার পাপে লিপ্ত হওয়া। হিন্দু রাষ্ট্রের ভাবনাতে এভাবেই একাকার হয়ে যায় দেশ, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা।

(লেখক একজন শিক্ষক)

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ১৫।।

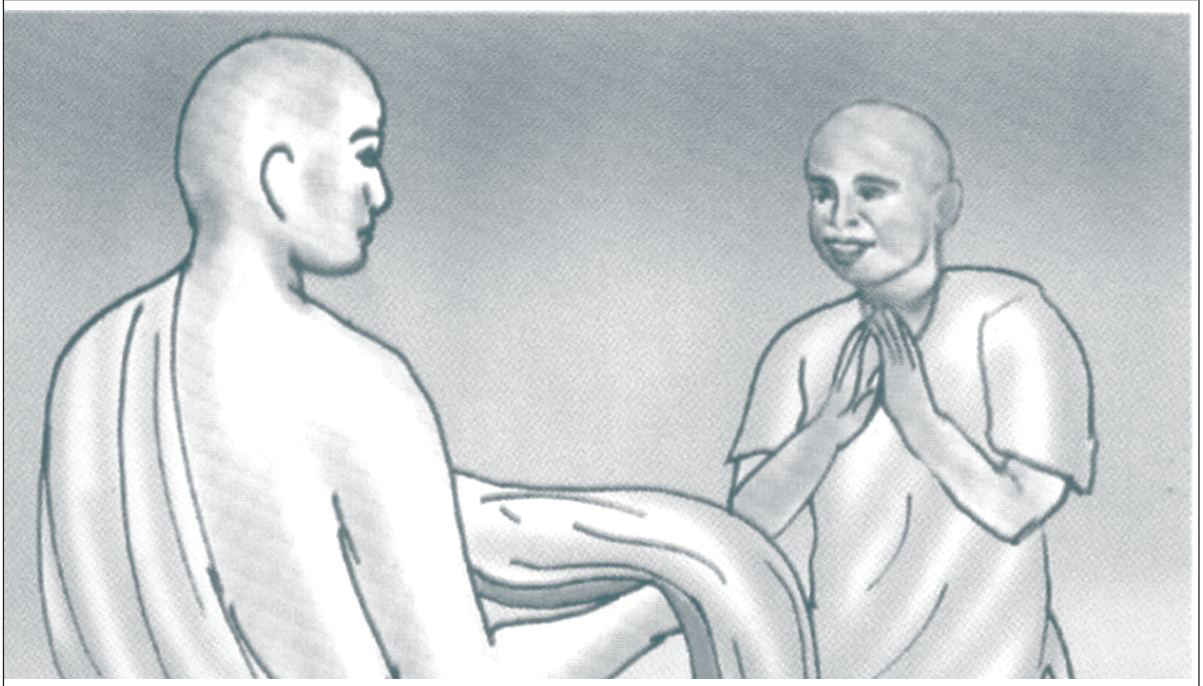

ছেলেকে আর ঘরে রাখা যাবে না বুঝে অবশেষে ১৩৩১ সালে মা নিজেই তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন শ্রী অঙ্গনে। নতুন জীবনে বঙ্কিমের নাম হল মহানামব্রত।

ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে মহানামব্রতজী ভর্তি হতে গেলেন সন্ন্যাসীর বেশেই। অধ্যক্ষ কামাখ্যানাথ মিত্র বৈরাগীদের শ্রদ্ধা করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল এরা কোনো কাজ করে না, শুধু খোল করতাল বাজিয়ে ভিক্ষা করে। এদের পড়াশোনা করে কী লাভ? কিন্তু তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন।

(ক্রমশ)